# ইবনে সিনা

আবু কায়সার

জীবনী গ্রন্থমালা

www.pathagar.com

www.pathagar.com

# ইবনে সিনা

## আবু কায়সার

বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র

www.pathagar.com

বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র প্রকাশনা ৯৭

**গ্রন্থমালা সম্পাদক**
আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ

**প্রথম বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র সংস্করণ**
ফাল্গুন ১৩৯৮ ফেব্রুয়ারি ১৯৯২

**ষষ্ঠ সংস্করণ দ্বাদশ মুদ্রণ**
অগ্রহায়ণ ১৪২৩ ডিসেম্বর ২০১৬

**প্রকাশক**
মো. আলাউদ্দিন সরকার
বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র
১৭ ময়মনসিংহ রোড, বাংলামটর, ঢাকা ১০০০
ফোন : ৯৬৬০৮১২ ৫৮৬১২৩৭৪ ০১৮৩৯৯০৬৭৫৪

**মুদ্রণ**
ওমাসিস প্রিন্টার্স
২৭৮/৩ এলিফ্যান্ট রোড, ঢাকা ১২০৫

**প্রচ্ছদ**
ধ্রুব এষ

**মূল্য**
পঁয়ষট্টি টাকা মাত্র

ISBN-984-18-0096-9

---

IBN SINA
A short biography of Ibn Sina by Abu Kaiser
Published by Bishwo Shahitto Kendro
17 Mymensing Road, Banglamotor, Dhaka 1000 Bangladesh

**Email : bskprokashona@gmail.com www.bsksale.com**

**Price : Tk. 65.00 only**

www.pathagar.com

## এক

মিহিরগন উৎসব ! সারাদেশ মেতে উঠেছে অফুরান আনন্দে। হাসিখুশি রঙ–তামাশা আর নাচেগানে ঝলমল করছে সমগ্র বোখারা। সেজেগুজে রাস্তায় বেরিয়েছে শিশু আর কিশোর–কিশোরীরা। বেণিতে গোলাপ লাগিয়ে হাততালি দিয়ে গান ধরেছে সুন্দরী যুবতীরা। ফলের বাজারগুলো উপচে উঠেছে ক্রেতার ভিড়ে। খচ্চরের পিঠে বসে বড্ড বেশি বুড়োরাও আজ বেড়াতে বেরিয়েছেন নগরীর রাজপথে। এমন আমোদ–আহ্লাদের দিনে পরদেশিরাও ঘরে বসে নেই। তারাও দল বেঁধে এই বিচিত্র উৎসব দেখতে ও তাতে শরিক হবার জন্যে চিত্রিত আলখাল্লা গায়ে চাপিয়ে বেরিয়ে পড়েছেন বাইরে। বোখারায় আজ ছুটির দিন। আজ কোনো কাজ নেই। আজ কেবল আনন্দ আর আনন্দ !

কেবল একটি ছেলের মুখে হাসি নেই। কে সে ? নাম তার হোসায়েন। বোখারার দেওয়ান আবদুল্লাহর পুত্র। ফুটফুটে চেহারা। বুদ্ধিদীপ্ত দুটি চোখে হাজারো জিজ্ঞাসার অজস্র ঝিকিমিকি। বয়েস মোটে দশ বছর; অথচ এরই মধ্যে মুখস্থ করে বসে আছে পুরো কোরআন শরিফ। তা, হাসিখুশি হোসায়েন অমন বিমর্ষ কেন আজ ? কী হয়েছে তার ? না, তার নিজের কিছুই হয়নি। তাদের মহল্লার একটি যুবক আজ মধ্যরাতে মারা গেছে। গোটা তল্লাটের সব বয়েসের মানুষ সেই যুবককে ভালোবাসত। চমৎকার চেহারা ছিল তার। আর ছিল নিটোল স্বাস্থ্য। যেমন বুদ্ধি তেমনি সাহস। আর ছিল দরদভরা মন। আপন–পর যে–ই হোক না কেন; কারো কোনো বিপদ ঘটলে সবার আগে ছুটে যেত এই মারুফ। ওর বাবা ইয়াকুব বোখারি তিন–রাস্তার মোড়ে একটা ছোট্ট সরাইখানা চালান। বুড়ো বয়েসে মোসাফিরদের দেখাশোনা করতে কতই–না কষ্ট তাঁর ! তবু তিনি মারুফকে দোকানে বসাননি। ছেলের যেরকম দয়ার শরীর— গরিব লোকদের বিনে পয়সায় খাইয়ে লালবাতি জ্বেলে দেবে ব্যবসায় !

পাড়ার ছেলেদের সর্দার ছিল মারুফ। আর হোসায়েন ছিল তার সর্বক্ষণের সঙ্গী। মারুফ অমন দুম করে মরে যাবে তা সে স্বপ্নেও ভাবেনি। সকালে সারা শহর যখন আনন্দ–উল্লাসে মেতে উঠতে শুরু করেছে, মনমরা হোসায়েন তখন শামিল হল মারুফের শবযাত্রায়। বড়রা প্রথমে তাকে সঙ্গে নিতে চাননি। একে তো দেওয়ানের ছেলে, তার ওপর অল্প বয়েস। এমন উৎসবের দিনে বাচ্চাদের গোরস্তানে যেতে



www.pathagar.com

দেয়া কি ঠিক হবে? নামানো গলায় একজন বললেন, শোনো হোসায়েন! তুমি বরং নতুন জামাকাপড় পরে বন্ধুদের সঙ্গে বাদশাহি বাগানে বেড়াতে যাও। সেখানে নাকি এক বিদেশি জাদুকর নানারকম হাতসাফাইয়ের খেলা দেখাবে। কিন্তু শবমিছিল থেকে কিছুতেই সরানো গেল না হোসায়েনকে। সামনে এক অনুচ্চ পাহাড়। শবযাত্রীরা এগিয়ে চলেছে সেই দিকেই। হোসায়েন সবার পেছনে ছোট ছোট পায়ে হেঁটে যেতে যেতে দেখল, ফুলে ফুলে ঢাকা মারুফের কফিনের উপর ভ্রমর উড়ছে। সে জানে, ওই পাথুরে পাহাড়ের উপরে আছে চওড়া চাতাল। এ তল্লাটে কোনো লোক মরে গেলে, ওখানেই তাকে কবর দেয়া হয়।

আঁকাবাঁকা রাস্তায় গোরস্তানে পৌঁছে শববাহকরা আর দেরি করল না। দোয়া-দরুদ পড়ে, মারুফকে সমাহিত করে তারা নিচে নেমে গেল তাড়াতাড়ি। এত বড় একটা উৎসব চলছে দেশে! তারাও যে তাতে শামিল হবে। বুড়ো ইয়াকুব বোখারি ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদলেন অনেকক্ষণ। তারপর তিনিও পাগড়ির কাপড়ে চোখ মুছতে মুছতে চলে গেলেন। স্তব্ধ, জনশূন্য কবরখানায় একপ্রান্তে হোসায়েন তখনো বসেছিল গালে হাত দিয়ে। এখানে-ওখানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে কয়েকটা পাথরের চাঁই। হোসায়েন বসেছিল তারই একটার উপর। ব্যস্ত ছিল বলে, যাবার সময় শবযাত্রীরা তাকে খেয়ালই করেনি। এমনকি টের পাননি ইয়াকুবও।

একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে পাথরটার উপর থেকে নেমে এল হোসায়েন। ধারেকাছে কেউ আছে কিনা, তা লক্ষ করল। তারপর আস্তে আস্তে এগিয়ে গেল মারুফের টাটকা কবরটার দিকে। চারদিকে চারখণ্ড পাথর। মাঝখানে কাঠের তৈরি একটা কফিন। আশপাশে ছোটবড় আরো অনেক কবর। তবে সেগুলোকে ক্ষয়ে-যাওয়া টিবির মতোই মনে হয়। রোদ-বাদলা আর তুষার-ঝড়ের ধকল বয়ে সেগুলো কোনোমতে যেন টিকে আছে অতীতের সাক্ষীস্বরূপ। মারুফের কবরটা সব থেকে নতুন। হোসায়েন কবরটার সামনে দাঁড়িয়ে ভাবল : মানুষ মরে কেন? সে মনে মনে চিন্তা করল, মরার পর মানুষের আত্মা কি শরীরের ভেতরেই থাকে? নাকি তা বাইরে বেরিয়ে ওই শেষনিশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গেই হাওয়ায় মিশে যায়? হোসায়েন বড়দের মুখে শুনেছে, মানুষের শরীর মরে; কিন্তু আত্মা মরে না।

মনের মধ্যে এরকম নানা কথা নাড়াচাড়া করতে করতে হঠাৎ তার ইচ্ছে হল, কফিনের ডালা খুলে সে একবার মারুফের লাশটাকে দেখবে। যেমন ভাবা, তেমনি কাজ। হোসায়েন কফিনের ঢাকনা তুলে মারুফের মুখের উপর থেকে কাফনের কাপড়টা সরাতে গেল। কিন্তু সরাতে পারল না। বরং হাতটা কেমন যেন কেঁপে গেল তার। বুকের ভেতর ধড়ফড় করছে। সে মরিয়ার মতো হ্যাঁচকা টানে কাপড়টুকু সরাতে যাবে— হঠাৎ অদূরেই জেগে উঠল এক মহা সোরগোল। হোসায়েন কফিনের ডালাটা দড়াম করে ফেলে দিয়ে চাতালের উত্তর প্রান্তে গিয়ে দাঁড়াল। হাওয়ায় চুল


www.pathagar.com

উড়ছিল তার। কচি মুখে বিন্দু বিন্দু ঘাম। আতর লোবান আর কর্পূরের ঘ্রাণে ম' ম' করছে গোটা গোরস্তান।

হোসায়েন অবাক হয়ে দেখল, উত্তরের মস্ত উঁচু খাড়া পাহাড় থেকে অতিকায় এক কাগজের পাখি হাওয়ায় ভাসিয়ে দিয়ে লাফালাফি করছে কয়েক হাজার লোক। কানে আসছে দামামা আর শিঙার আওয়াজ। সেইসঙ্গে উল্লসিত মানুষের প্রচণ্ড হৈ-হল্লা। মিহিরগন উৎসবের এই এক রীতি। উৎসবেরই একটা পর্যায়ে এসে নগরবাসী রঙিন কাগজে বানানো ওই ঢাউস পাখির গায়ে আগুন লাগিয়ে তা পাহাড় থেকে নিচে ছেড়ে দেয়। আর পাখিটা পুড়তে পুড়তে এক বিচিত্র দৃশ্যের অবতারণা করে হাওয়ায় ভেসে নিচের গিরিখাত ধরে উড়ে যেতে থাকে।

জ্বলন্ত পাখিটা খুবই ধীর গতিতে নিচের দিকে নেমে যাচ্ছিল তখন। একদৃষ্টে সেই দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে হোসায়েন ভাবল, মারুফের প্রাণপাখিও তার বুকের খাঁচা থেকে বাইরে বেরিয়ে এমনি করেই উড়ে পালিয়েছে। ছোট্ট একটা নিশ্বাস ফেলে পাহাড় থেকে নেমে এল হোসায়েন। মারুফের শোকে বুকটা যেন তার ফেটে যাচ্ছে। কিন্তু ওর বুড়ো বাপের মতো সে তো কাঁদতেও পারছে না।

প্রাসাদে ফিরে হোসায়েন ঝুলবারান্দায় দাঁড়িয়ে রইল চুপচাপ। দূরে সারি সারি ঢেউ খেলানো পাহাড়। ওখানেই, এক অনুচ্চ পাহাড়ের মাথায় টকটকে লাল কাপড়ে তৈরি একটা তেকোণা নিশান উড়ছে। ওটাই তো এই এলাকার কবরখানা। ওখানেই যে একলা একা ঘুমিয়ে আছে মারুফ! প্রাসাদের জলসাঘর থেকে নাচগানের আওয়াজ আর সমঝদারদের কোলাহল ভেসে আসছিল। সবকিছু হোসায়েনের অসহ্য লাগল। সে কানে আঙুল দিয়ে দুচোখ বুজে দাঁড়িয়ে রইল অনেকক্ষণ। পরে হৈ-হট্টগোল কমে এলে নিজের ঘরে ঢুকে একটা বই নিয়ে বসল।

## দুই

কে এই ভাবুক কিশোর? কে আবার— ইবনে সিনা!

ছেলেবেলায় যাকে সবাই হোসায়েন বলে ডাকত সেই ছেলেটিই একদিন জ্ঞানের আলোয় ভাসিয়ে দিলেন দশদিক। দর্শন, বিজ্ঞান আর চিকিৎসা ক্ষেত্রে যুগান্তকারী অবদান রেখে দুনিয়াজুড়ে সাড়া জাগালেন অতি অল্প বয়েসে। যুগস্রষ্টা এই মনীষীর পুরো নাম আবু আলী আল হোসায়েন ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে সিনা। সংক্ষেপে বু আলী সিনা বা ইবনে সিনা। ইউরোপীয়দের কাছে যিনি ছিলেন আভি সিনা নামেই পরিচিত।

ইবনে সিনার গোটা জীবনটাই ছিল নানা রোমাঞ্চে ভরপুর। তাঁর অবিশ্বাস্য ক্ষমতা আর গুণাবলি নিয়ে বিশ্বব্যাপী সত্যমিথ্যা কত যে কাহিনী রটেছে তার ইয়ত্তা



www.pathagar.com

নেই। কিন্তু সেই গল্প থেকে সত্য-মিথ্যা খুঁজে বার করাও অসম্ভব। কেননা, তাঁর ঘটনাবহুল জীবন ছিল রূপকথাকেও হার মানানোর মতো।

মুসলিম স্বর্ণযুগে যে কজন বরেণ্য মানুষ বিশ্বের ভাবজগতে আলোড়ন আনেন, তাঁদের মধ্যে ইবনে সিনার নাম বিশেষ শ্রদ্ধার সঙ্গে উচ্চারিত। এই মনীষীর বিপুল কর্মকৃতির খুব সামান্য ইতিহাসই এ-পর্যন্ত খুঁজে পাওয়া গেছে। কিন্তু তাতেই চমকে উঠেছে সারা পৃথিবী। মাথা নুইয়ে সম্মান জানিয়েছে অহঙ্কারী ইউরোপ। প্রাচীন কালের গ্রিক মনীষী অ্যারিস্টটল, প্লেটো ও সক্রেটিসের মতো ইবনে সিনা নামটিকেও তারা সযত্নে লিপিবদ্ধ করেছে সংস্কৃতি ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের আবহমান ইতিহাসে। তবে পূর্বোল্লিখিত ইউরোপীয় মনীষীদের মতো ব্যাপক পরিচিতি না-পাওয়ায় তাঁর আসনটি নির্ধারিত হয়েছে কিছুটা অনুজ্জ্বল অধ্যায়ে। কিন্তু এ-কথা সবাই স্বীকার করেছেন যে— আল বেরুনী, আল রাজি কিংবা ওমর খৈয়ামের মতো, ইবনে সিনার প্রতিও ইতিহাস সুবিচার করেনি। কিন্তু তাতে কী! ইবনে সিনা উদ্ভাসিত হয়েছেন স্বমহিমায়।

ইবনে সিনার জন্ম মধ্যযুগে, যখন মানুষের মানবিক বৃত্তিগুলো চাপা পড়ে ছিল শাসকের দম্ভ, উচ্ছৃঙ্খলতা আর ক্ষমতালিপ্সার অন্ধকার গুহায়। রাজনৈতিক ঝড়ঝঞ্ঝা অর্থাৎ হানাহানি ছিল নিত্যকার ব্যাপার। এরকম একটা অদ্ভুত সময়ে ইবনে সিনার মতো সর্বতোমুখী প্রতিভার অধিকারী একজন মানুষের আবির্ভাব বিস্ময়কর বৈকি! চারদিকে অশান্তি আর অস্থিতি। শাসকদের ক্ষমতার মোহ ছিল বংশানুক্রমিক। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল আবার ধর্মীয় গোঁড়ামি। স্রেফ ধর্মের দোহাই দিয়ে সেকালে যে কত রক্ত ঝরানো হয়েছে তার হিসেব নেই। এ অবস্থায় মেধাবী মানুষের চিন্তাভাবনা যে পদে পদে হোঁচট খাবে, তাতে আর সন্দেহ কি!

একজন বিশিষ্ট গবেষক এই দুঃখজনক পরিস্থিতির ব্যাখ্যা দিয়েছেন এভাবে : 'প্রাচ্যের মানসিক আবহাওয়াই ছিল এ অবস্থার জন্যে দায়ী। এ আবহাওয়া বাস্তব চিন্তাচেতনা নিয়ে মানুষকে বেশিদূর এগোতে দেয় না। সত্য খুঁজে বের করার বয়েস এলেই মানুষকে আঁকড়ে ধরে নানা পারলৌকিক ভাবনা। ফলে নিরপেক্ষভাবে বিজ্ঞানজগতের সত্য উদ্‌ঘাটনের কোনো উৎসাহই আর ফলপ্রসূ হয়ে ওঠে না।'

বলা বাহুল্য, ইবনে সিনার জীবনও এই পরিস্থিতির বাইরে আবর্তিত হয়নি। ব্যতিক্রমী ঘটনা ছিল এটাই যে, তিনি নিজের অসামান্য প্রতিভাবলে দর্শন ও বিজ্ঞানের সেকেলে বৃত্তটি ভেঙে বাইরে বেরুতে চেষ্টা করেছিলেন। তিনি যে অনেকখানি সফল হয়েছিলেন, তা দুনিয়া দেখেছে। কিন্তু পরিতাপের ব্যাপার এটাই যে, তাঁর অসমাপ্ত কিন্তু অনন্যসাধারণ অবদানকে তাঁর উত্তরসূরিরা সামনের দিকে আর এগিয়ে নিয়ে যাননি। অগ্রজের ব্যবহৃত পথে অগ্রসর না হয়ে তাঁরা বরং চর্বিত



www.pathagar.com

চর্বন করেছেন। এইভাবে স্তূপীকৃত হয়েছে পুরনো তত্ত্বেরই নতুন নতুন ব্যাখ্যা। ইবনে সিনা দর্শন ও বিজ্ঞানকে বিবেচনা করেছিলেন নবতর দৃষ্টিকোণ থেকে। তিনি ছিলেন উদার মনের মানুষ। ধর্মের নামে বাড়াবাড়ি তিনি আদপেই পছন্দ করতেন না। তাঁর কাছে মানুষ ছিল সবকিছুর ওপর। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে সংস্কৃতি সবার জন্যে। আলো কিংবা বাতাস যেমন কোনো সীমারেখা মানে না, সংস্কৃতি তেমনি মুক্ত ও সর্বগামী। কোনো বিশেষ দেশ, জাতি বা ধর্মের বেড়া দিয়ে তাকে আটকানো যায় না। তাই, দর্শন, বিজ্ঞান ও কৃষ্টি চর্চায় যাঁরা নিবেদিত, তাঁদের অবদান কারো একক সম্পত্তি নয়— তা সারা পৃথিবীর সব মানুষের জন্যে।

কর্মচঞ্চল জীবনে জ্ঞানবৃক্ষের প্রতিটি শাখাই স্পর্শ করেছেন ইবনে সিনা। আর যেখানেই হাত দিয়েছেন, সেখানেই ঝলমল করে উঠেছে সুস্বাদু ফল। সেখানেই ফলেছে সোনা। অথচ একসময় তাঁকে একজন গুণী চিকিৎসক হিসেবেই কেবল গণ্য করা হত। ষোড়শ শতাব্দী পর্যন্তও প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যে এই ধারণা বলবৎ ছিল। পরে সব জায়গাতেই ইবনে সিনা স্বীকৃত হয়েছেন একজন উঁচুদরের দার্শনিক হিসেবে।

ইবনে সিনার মতে, প্রকৃত দর্শন তিনভাগে বিভক্ত। যেমন ন্যায়শাস্ত্র (Logic), পদার্থবিদ্যা (Physics) এবং মনোবিজ্ঞান (Metaphysics)। তিনি বলতেন, একজন প্রকৃত দার্শনিকই হলেন সবচেয়ে বড় জ্ঞানী। পাশ্চাত্যের বিদ্বজ্জনমণ্ডলে ইবনে সিনার যেসব মতবাদ সম্মানের সঙ্গে গৃহীত হয়েছে, সেগুলোর অন্যতম হচ্ছে— মূলাকাত। এই মূলাকাত বা Intentio মূলত এমন এক বিষয়, যা অনুভব করা যায় প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ— এই দুভাবেই। ইবনে সিনার এ মতবাদ ধার্মিক মুসলমান সমাজে নিন্দিত হয়েছিল। কোরআন ও হাদিসে অভ্যস্ত মুসলিম সমাজ এই দর্শন অগ্রাহ্য করেছিল। কেবল তাই নয়, এই মতবাদের প্রতিবাদে তারা 'গ্রিকের কুকীর্তির কাহিনী ও কিঞ্চিৎ ধর্মীয় উপদেশ' এবং 'কোরআনের দর্শনের মতবাদ খণ্ডনের চাক্ষুষ প্রমাণ' নামে দুটি পুস্তিকাও প্রকাশ করে। ইমাম গাজ্জালি কাফের বলেও অভিযুক্ত করেছিলেন ইবনে সিনাকে।

ইবনে সিনা বলতেন, মানুষের দেহ বিভক্ত হলেও আত্মা বিভক্ত হয় না। তাই দেহ বিনষ্ট হবার পরও আত্মা অবিকৃত থাকে। তিনি অদৃষ্টবাদেও বিশ্বাস করতেন। তাঁর মতে জন্ম, মৃত্যু ও সুখ-দুঃখের ওপর মানুষের কোনো হাত নেই। সবকিছুই ভাগ্যের অধীন। ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করে এক মহাশক্তি— যা অনাদি অনন্ত ও অবিনশ্বর। আত্মা সম্পর্কে ফরাসি দার্শনিক দেকার্তের মতের সঙ্গে ইবনে সিনার মতের অনেক মিল রয়েছে।

যাই হোক, এসব মতামত তখনকার মুসলমান সমাজকে ক্রুদ্ধ করেছিল। শোনা যায়, সে সময়ের এক বিশিষ্ট দার্শনিক মৃত্যুশয্যায় মন্তব্য করেন : 'খোদা যা বলেছেন, তাই সত্য; ইবনে সিনাই মিথ্যাবাদী।' কিন্তু এই প্রতিক্রিয়ায় ইবনে সিনা



www.pathagar.com

উত্তেজিত হননি। ধর্মের নানা জটিল মতবাদকেও তিনি বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির মাধ্যমে যুক্তি দিয়ে বিচার করেছেন। তাঁর সঙ্গে অকাট্য যুক্তি দিয়ে গাজ্জালির মত খণ্ডন করেছেন ইবনে রুশদ নামে আরেকজন দার্শনিকও।

পরবর্তীকালে অবশ্য ইসলামি মতবাদের সঙ্গে তাঁর নিজস্ব মতবাদের সমন্বয় সাধনের চেষ্টা করেছেন ইবনে সিনা। ইবনে সিনা আত্মার অমরত্ব ও অবিনশ্বরতার কথা সহজবোধ্যভাবে তুলে ধরেছেন। সে-সময় প্রাচ্যে এই মতবাদ অ্যারিস্টটলের এবং এর বিপরীত মতবাদ প্লেটোর মতবাদ বলে পরিচিত ছিল। ইবনে সিনার মতবাদ এবং ধর্মমতের মধ্যে এক সুন্দর সামঞ্জস্য লক্ষ করা যায়। সেকালের অন্যান্য মুসলমান দার্শনিকের মতো ইবনে সিনাও তাঁর চিন্তাধারাকে তুলে ধরেছেন কবিতার পঙ্‌ক্তিতে। একটি কবিতায় আত্মাকে তিনি পাখির সঙ্গে তুলনা করেছেন। এই পাখিটি মায়াভরা পৃথিবীর সব বন্ধন ছিন্ন করে ঊর্ধ্বলোকে উড়ে যেতে চায় পরমাত্মার কাছে। জীবনভর সে এই আকাঙ্ক্ষা বুকে নিয়ে ছটফট করে। অবশেষে মরণের দূত এসে তার খাঁচার দুয়ার খুলে দেয়।

কেবল কবিতা নয়, ইবনে সিনা গদ্যও লিখতেন। দর্শন ও সাহিত্যের পাশে বিজ্ঞানকে বেমানান মনে হলেও তাঁর মধ্যে এই দুয়ের বিচিত্র সমন্বয় ঘটেছিল। নিজের জীবনকালে দার্শনিক খ্যাতি তেমন বিস্তৃত না-হলেও চিকিৎসক হিসেবে তাঁর কৃতিত্বের খবর সমগ্র প্রাচ্যে ছড়িয়ে পড়েছিল। চিকিৎসাবিজ্ঞানে ইবনে সিনাকে বলা হয় 'আল মুয়াল্লিম আসসানি' বা দ্বিতীয় শিক্ষক। গ্যালেনকে বিবেচনা করা হয়েছে প্রথম শিক্ষক হিসেবে।

ইবনে সিনা গ্রিক, রোমক, ভারতীয় ও চৈনিক চিকিৎসা-পদ্ধতির সার সংগ্রহ করে 'কানুন' বা 'চিকিৎসা বিজ্ঞানের সূত্রাবলি' রচনা করেন। পাঁচ খণ্ডে সমাপ্ত এই বইয়ের দ্বিতীয় খণ্ডে ৭৮৫টি ভেষজ, প্রাণিজ ও খনিজ ওষধির বর্ণনা আছে। এর মধ্যে অনেকগুলোই এখনো ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়। পামির অঞ্চলের অধিবাসীদের বিশ্বাস— মধ্য এশিয়ার সোনালি ঈগল ও দীর্ঘপুচ্ছ সমুদ্র-ঈগলের পিত্তে ওষধিগুণ আছে। প্রচণ্ড মাথাধরা বা মানসিক রোগে এ ওষুধ আশ্চর্য ফলদায়ক। ওষধিগুণ রয়েছে আলপাইন-টার্কির মাংসেও। পামির এলাকায় গ্যাস্ট্রিক ও চক্ষুরোগের চিকিৎসায় এই মাংস আজও কাজে লাগে। এসব ওষধি সম্পর্কে ইবনে সিনা হাজার বছর আগেই বিশদভাবে লিখে গেছেন। অল্পকাল আগে তাঁর লেখা যে চিকিৎসাগ্রন্থটি পাওয়া গেছে তাতে দেখা যায়, তিনিই সাইকোথেরাপি বা মনো-চিকিৎসার উদ্ভাবক। আগেই বলা হয়েছে, ইবনে সিনা বিভিন্ন দেশের প্রাচীন চিকিৎসাশাস্ত্র ঘেঁটে সেগুলোর সার-সংকলন করেন। ফলে তাঁর তত্ত্ব বা গ্রন্থের মৌলিকতা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন অনেকেই। কিন্তু কিছুকাল আগে দিল্লির জামিয়া মিলিয়া গ্রন্থাগারে ইবনে সিনার একটি পাণ্ডুলিপি আবিষ্কার করেছেন অধ্যাপক


www.pathagar.com

সিফাউল মুলক হাকিম আবদুল লতিফ। এই পাণ্ডুলিপির ওপর গবেষণায় ব্রতী হয়ে অধ্যাপক দেখেছেন, হৃদরোগের চিকিৎসায় ইবনে সিনা যে ওষুধের বিধান দিয়েছেন, তা সম্পূর্ণ মৌলিক।

একটি-দুটি নয়— মোট নিরানব্বুইটি বই লিখেছিলেন ইবনে সিনা। এর মধ্যে 'আশ শেফা' ও 'আল কানুন'ই সবচেয়ে বড় ও বিখ্যাত। আশ শেফার বিশ খণ্ডে প্রাণী, উদ্ভিদতত্ত্ব, রাজনীতি ও অর্থনীতি প্রসঙ্গ আলোচিত হয়েছে। 'আল কানুন' পাঁচ খণ্ডে রচিত। এতে রয়েছে প্রায় দশ কোটি শব্দ। সাধারণ হিসেবে এ বইয়ের মোট পৃষ্ঠাসংখ্যা প্রায় পাঁচ লাখ। তাঁর লেখা 'আরযুজাফিল তিব্ব' পদ্যাকারে লেখা একটি চিকিৎসাগ্রন্থ। ১৩৩৬টি কবিতা আছে এ বইয়ে। রোগের বর্ণনা ও তার সুচিকিৎসার সুবিধার্থে তিনি সহজ পদ্যের আকারে এ বইটি লিখেছেন নতুন চিকিৎসকদের জন্যে। বলা বাহুল্য, তরুণ চিকিৎসকরা লুফে নিয়েছিলেন এই ছন্দোবদ্ধ ব্যবস্থাপত্র।

মধ্যযুগে সারা বিশ্বেই ইবনে সিনার প্রভাব ছিল প্রবল। দ্বাদশ থেকে সপ্তদশ শতাব্দী পর্যন্ত তাঁর অসামান্য চিকিৎসাগ্রন্থ 'আল কানুনে'র লাতিন অনুবাদ ইউরোপীয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে পাঠ্যপুস্তক হিসেবে নির্ধারিত ছিল। লাতিনে কানুনের তরজমা করেন ক্রিমোনায় জিরার্ড। ইউরোপীয়রা ইবনে সিনাকে অভিহিত করেছিল মাস্টার অফ মেডিসিন বা চিকিৎসাবিজ্ঞানের গুরু বলে। আজো ইউরোপে তাঁকে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করা হয় প্রাচ্যের গ্যালেন বা আরব গ্যালেন হিসেবে।

স্যার অসলারের মতে, দুনিয়ায় অন্য কোনো বই-ই 'কানুনে'র মতো এত দীর্ঘকালব্যাপী চিকিৎসাশাস্ত্রের বাইবেল বলে আদৃত হয়ে আসেনি। এ বইয়ের বহু ভাষায় বহু অনুবাদ এখনো দেখতে পাওয়া যায়। নানা জায়গায় ইউরোপে এর চাহিদা ছিল খুবই বেশি। পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ ত্রিশ বছরে এর যে-ষোলটি সংস্করণ প্রকাশিত হয়, তার পনেরটি ছিল লাতিন আর একটি হিব্রুতে।

ইউরোপীয় রেনেসাঁ বা নবজাগরণের যুগে মুসলমান লেখকদের বিজ্ঞান-বিষয়ক বই অনুবাদের হিড়িক লেগে যায়। তবে ক্রুসেড বা ধর্মযুদ্ধের আগে পর্যন্ত প্রাচ্যের মুসলিম কৃষ্টির সঙ্গে ইউরোপীয় সংস্কৃতি বা কালচারের সরাসরি সম্পর্ক গড়ে ওঠেনি। স্পেনের মুসলমানদের সহায়তায় ঘুমন্ত ইউরোপ ধীরে ধীরে জেগে উঠতে শুরু করে। স্পেনীয়দের অনুপ্রেরণাতেই মুসলিম পণ্ডিতদের লেখা বিজ্ঞান-বিষয়ক কিছু কিছু বই লাতিনে অনূদিত হতে থাকে। ইউরোপে প্রকৃত জাগরণ আসে দ্বাদশ শতাব্দীতে। সেখানে জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা আরম্ভ হয় বলতে গেলে সেই সময়েই।

ত্রয়োদশ শতাব্দীতে জ্ঞান-বিজ্ঞানে বিরাট উৎকর্ষ অর্জন করে ইউরোপ। ইউরোপীয় মিশনারি জে. জে. ওয়াশাক এই যুগকে শ্রেষ্ঠ যুগ বলে অভিহিত করেছেন। মূলত এই সময় থেকেই জ্ঞান-বিজ্ঞানে ইউরোপীয় আধিপত্যের



www.pathagar.com

সূচনা এবং একই সঙ্গে আগেকার মুসলিম গৌরব ধীরে ধীরে ম্লান হয়ে আসতে শুরু করে। আর প্রাচ্যের অভিজ্ঞতাকে আত্মস্থ করে ইউরোপ ক্রমান্বয়ে এগোতে থাকে উন্নতির পথে। বস্তুত মুসলিম সভ্যতার ভিত্তির ওপর ত্রয়োদশ শতাব্দীতেই গড়ে ওঠে ইউরোপীয় সভ্যতার বিশাল প্রাসাদ। ইউরোপের আদলটাই যায় পাল্টে। তবে বিস্ময়ের ব্যাপার এটাই যে, দু-তিনশো বছরের মধ্যেই ইউরোপ তার ত্রিসীমানা থেকে আরব সভ্যতার বহিরাবরণ পুরোপুরি মুছে ফেলে। ইউরোপকে আরব তথা মুসলিম-বিশ্ব কী শেখাল, বাইরের জগৎ থেকে সে-কথা বুঝবার কোনো উপায়ই আর থাকল না। তবে বাইরের পালিশ বদলে ফেললে হবে কী— ভেতরে ভেতরে আরব সভ্যতা সমগ্র ইউরোপে তার অপ্রতিহত প্রতিপত্তি চালিয়ে যেতেই থাকে।

## তিন

ইবনে সিনার জন্ম ৯৮০ খ্রিস্টাব্দে। ৩৭৫ হিজরির ৩ সফর ছিল এই দিনটি। বাবা আবদুল্লাহ ছিলেন বোখারার বাদশাহ নূহ বিন মনসুরের দেওয়ান বা গভর্নর। মা সেতারা বিবি ছিলেন তুর্কিস্তানের ঐতিহ্যবাহী গ্রাম আফসানার এক বিত্তশালী পরিবারের মেয়ে। বু আলীই তাঁদের প্রথম সন্তান। দ্বিতীয় সন্তানের জন্মের পর আবদুল্লাহ আফসানার পাট চুকিয়ে সপরিবারে চলে এলেন বোখারায়। অনেকের মতে, বু আলী বা ইবনে সিনার জন্ম আফসানাতেই। আবার কারো কারো ধারণা, তিনি জন্মগ্রহণ করেন বলখ প্রদেশে।

ইবনে সিনার জন্মস্থান নিয়ে বিতর্কের পেছনে কারণ আছে। প্রধান কারণটি এই যে, তাঁর বাবা আবদুল্লাহ বাপ-দাদার ভিটে ছেড়ে অন্য জায়গায় গিয়ে বসতি স্থাপন করেছিলেন। একসময় অবশ্য তাঁর পূর্বপুরুষরা বসবাস করতেন আফগানিস্তানের উত্তরে অবস্থিত বলখ প্রদেশে। খুব সম্ভব রাজনৈতিক অথবা অর্থনৈতিক কারণেই বলখ ছেড়ে বোখারায় চলে আসেন আবদুল্লাহ। তবে এই স্থানান্তরের তারিখ সম্পর্কে সঠিক তথ্য পাওয়া যায় না। কেউ কেউ মনে করেন, আবদুল্লাহ বলখ পরিত্যাগ করেন ইবনে সিনার ছোটভাইটি জন্মাবার পর। আবার অনেকের ধারণা, ইবনে সিনার জন্মের আগেই আবদুল্লাহ বোখারায় গিয়ে থিতু হন।

আবদুল্লাহ নিজেই কেবল উঁচু রাজপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন না, অনেক আগে থেকেই তাঁদের বংশের লোকেরা রাজনীতির সঙ্গে জড়িত। তাই ইবনে সিনার শৈশব কেটেছে আভিজাত্য এবং প্রাচুর্যের মধ্যে। কিন্তু এমন একটি পারিবারিক পরিবেশেও ইবনে সিনার মধ্যে দেখা গেল তীক্ষ্ণবুদ্ধি আর অসাধারণ মেধা। অবশ্য ছেলের শিক্ষাদীক্ষার ব্যাপারে বাবা ছিলেন খুবই সজাগ। শোনা যায়, কেবল ছেলেদের লেখাপড়া শিখিয়ে মানুষ করার জন্যেই আবদুল্লাহ পৈতৃক ভিটের মায়া ত্যাগ করেন।



www.pathagar.com

বোখারায় এসেই তিনি ছেলের জন্যে নিযুক্ত করেন গৃহশিক্ষক। তখন ইবনে সিনার বয়েস মোটে পাঁচ বছর।

দেওয়ান আবদুল্লাহ্ ছিলেন ইসমায়েলি শাস্ত্রের প্রতি অনুরাগী। বাড়িতে এই মতবাদ প্রচারকদের আনাগোনা লেগেই থাকত। কেউ কেউ বেশ কিছুদিনের জন্যে আস্তানাও গাড়তেন দেওয়ানের প্রাসাদে। ইবনে সিনার বিস্ময়কর মেধার পরিচয় পেয়ে তাঁরা তাজ্জব বনে যান। নিজেদের তত্ত্বকথা তাঁরা সহজভাবে বোঝানোর চেষ্টা করতেন ওই প্রতিভাবান বালকটিকে। আবদুল্লাহ্ নিজেও চাইতেন, ছেলে ইসমায়েলি শাস্ত্র সম্পর্কে জ্ঞানলাভ করুক। কিন্তু প্রচারকদের তত্ত্বকথা কেবল মন দিয়ে শুনেই যেতেন ইবনে সিনা। ওইসব মত ও যুক্তি তাঁর কোমল মনে বিন্দুমাত্র প্রভাবও ফেলতে পারেনি। ব্যাপারটা আবদুল্লাহ্ কিংবা প্রচারকদের দৃষ্টি এড়িয়ে যায়নি। তাঁরা এই ছোট্ট ছেলেটির নীরব উপেক্ষায় অবাক হয়েছিলেন।

নতুন জায়গায় গুছিয়ে বসেই ছেলের জন্যে উপযুক্ত শিক্ষক খুঁজছিলেন দেওয়ান আবদুল্লাহ্। কিন্তু কাজটা খুব দুঃসাধ্য বলেই মনে হল তাঁর কাছে। কেন? না, অনেক চেষ্টার পরও যোগ্য শিক্ষকের খোঁজখবর মিলছিল না। একদিন তিনি শুনতে পেলেন, ধারেকাছেই এমন একজন ফলবিক্রেতা আছে যে অঙ্কশাস্ত্রে খুবই দক্ষ। দেওয়ান সঙ্গে সঙ্গেই ছেলেকে পাঠালেন সেই ফলঅলার কাছে। ইবনে সিনার মতো মেধাবী ছাত্র পেয়ে ফলবিক্রেতা মাহমুদ মসসা তো বেদম খুশি। তিনি খুব সহজে আর অল্পদিনের মধ্যে ইবনে সিনাকে শিখিয়ে দিলেন অঙ্কশাস্ত্রের প্রাথমিক খুঁটিনাটি।

ফলঅলা ছাড়াও ইবনে সিনার জন্যে নিযুক্ত করা হয় আরো তিনজন গৃহ-শিক্ষক। ইসমাইল জাহেদের তত্ত্বাবধানে শিক্ষাগ্রহণ করে দশ বছর বয়েসেই কোরআন আর সাধারণ সাহিত্যে বিশেষ পারদর্শী হয়ে ওঠেন তিনি। তাছাড়া দর্শন আর বীজগণিতেও ব্যাপক জ্ঞান অর্জন করেন ইবনে সিনা। কেবল তাই নয়— খুবই কম সময়ের মধ্যে এসব বিষয়ে ছাত্র তাঁর শিক্ষকদেরকেও ছাড়িয়ে যান। তখন স্বাভাবিকভাবেই শিক্ষক বদলানোর প্রয়োজন দেখা দেয়। এ-সময় ইসা ইবনে ইয়াহিয়া নামে এক খ্রিস্টান শিক্ষক তাঁকে চিকিৎসাশাস্ত্র, পদার্থবিদ্যা, দর্শন ও ভূগোলশাস্ত্র শিক্ষা দেন।

এরই মধ্যে একদিন দুম করে হঠাৎ কোত্থেকে বোখারায় এসে হাজির হলেন ভবঘুরে পণ্ডিত আন নাতিলি। ইনি ছিলেন ছটফটে স্বভাবের লোক। যেন তাঁর পায়ের তলায় সরষের মুড়মুড়ি লেগেই আছে। ফলে এক জায়গায় বেশিদিন থাকা তাঁর ধাতে সইত না। কিন্তু শিক্ষাদানের ক্ষমতায় অন্য শিক্ষকদের তিনি টপকে গিয়েছিলেন। অমন জ্ঞানীগুণী মানুষ অথচ যেন আজন্ম এক যাযাবর। তাঁর এই প্রবৃত্তিই তাঁকে এক জায়গায় বেশিদিন তিষ্টোতে দেয় নি। আবদুল্লাহ্ তাঁকে অনেক



www.pathagar.com

বুঝিয়েসুঝিয়ে প্রচুর অর্থ ও যথাযোগ্য বাসস্থানের ব্যবস্থা করে বোখারায় আটকে রাখেন বেশ কিছুদিন।

বিদগ্ধ পণ্ডিত আন নাতিলির কাছে ইবনে সিনা পরম উৎসাহে ফিকাহ, ন্যায়শাস্ত্র, জ্যামিতি ও জ্যোতির্বিদ্যার পাঠ নিলেন। এসব বিষয়ে বহু জটিল সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে ছাত্রের প্রখর বিচারবুদ্ধি ও স্মৃতিশক্তি দেখে একেক সময় হতবাক হয়ে যেতেন নাতিলি। খুব সম্ভব আন নাতিলিই ইবনে সিনার প্রথম দর্শন-শিক্ষক।

যেমন শিষ্য, তেমনি গুরু। কিন্তু শিষ্য অতি অল্প সময়ে সবদিক দিয়ে গুরুকে ছাড়িয়ে গেলে পরাজয় স্বীকারে কুণ্ঠিত হননি আন নাতিলি। অবশ্য ছাত্রের অসম্ভব মেধার পরিচয় পেয়ে নাতিলি আগেই আবদুল্লাহকে বলেছিলেন— শুনুন বলি, আপনার এই ছেলেটি একদিন মস্তবড় পণ্ডিত হবে। আমার অনুরোধ, আপনি একে অন্য কোনো কাজে লাগাবেন না। সে যেন লেখাপড়াতেই লেগে থাকে।

উদার মনের মানুষ ছিলেন আন নাতিলি। বহু ব্যাপারে তিনি নিজের মতবাদ পরিত্যাগ করে ইবনে সিনার ব্যাখ্যা ও মতামত মেনে নিতেন বিনা দ্বিধায়। এমনকি ছাত্রের কাছ থেকে বহু কঠিন বিষয় বুঝে নিতেও তিনি লজ্জা বোধ করতেন না। মনে-প্রাণে বোহেমীয় হলেও স্রেফ স্নেহের টানেই এতদিন একজায়গায় স্থিরভাবে কাটিয়েছেন তিনি। বিশেষ করে এরকম মেধাবী একটি ছাত্রকে পেয়ে নাতিলির যাযাবরি মনোবৃত্তিতে সাময়িকভাবে একটা ছেদ এসে গিয়েছিল। কিন্তু শিগগিরই তিনি বুঝতে পারলেন, ওই ছাত্রকে আর বেশিকিছু শেখানোর বিদ্যা তাঁরও নেই। ইবনে সিনার মেধা আর নিজের দুর্বলতা তাঁর স্থিতিশীল জীবনযাপনের অবসান ঘটিয়ে দিল। এখানে থাকার প্রয়োজন ফুরিয়েছে ভেবে নাতিলি একদিন বোখারার পাট চুকিয়ে দিয়ে খারিজনের উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে গেলেন।

নাতিলি চলে গেলেও পড়াশোনায় ছেদ পড়ল না ইবনে সিনার। তিনি একা-একাই পড়তে শুরু করলেন পদার্থবিদ্যা ও মনোবিজ্ঞান। অল্পদিনের মধ্যেই তাঁর আয়ত্তে এসে গেল জ্ঞানগর্ভ গ্রিক গ্রন্থের তরজমা— *আল ফাসুস* ও *আসরুর*।

এ-সময় চিকিৎসাশাস্ত্র ইবনে সিনাকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করে। তিনি চাইতেন, এ ব্যাপারে হাতে-কলমে শিখতে। তাই এ বিদ্যা আয়ত্ত করতে তাঁকে খুব একটা বেগ পেতে হয়নি। কিন্তু দর্শন বিষয়টা তাঁর কাছে বেশ কঠিন মনে হত। তাতে অবশ্য পিছু হটে যাননি তিনি। বরং এই শাস্ত্র আয়ত্তে আনতে যে কঠোর সাধনায় তিনি নিবেদিত হন, তা ছিল সত্যি বিস্ময়কর। দর্শনের কঠিন সূত্রগুলোর যখন আর কোনো খেই পেতেন না, তখন মসজিদে গিয়ে খোদার কাছে সাহায্য প্রার্থনা করতেন। সন্ধ্যার পর বাড়িতে ফিরে এসে আবার শুরু করতেন অধ্যয়ন। খোলা বই সামনে নিয়ে সারাটা রাতও পার করে দিতেন কোনো-কোনো দিন।



www.pathagar.com

এ-সময় ইবনে সিনার বয়েস মাত্র ষোল বছর। এ বয়েসে রাত জেগে পড়াশোনা সত্যিই খুব কঠিন ব্যাপার। পড়তে পড়তে দেহ অবসন্ন হয়ে আসত। দুচোখ জড়িয়ে আসত ঘুমে। কিন্তু নিদ্রাদেবীর কাছে সহজে আত্মসমর্পণের পাত্র ছিলেন না ইবনে সিনা। যখন ঘুমিয়ে পড়তেন, তখনো মগজের মধ্যে হানা দিত দর্শনের নানা সূত্র। ঘুমের ভেতরেও বহু জটিল সমস্যা সমাধানের ব্যাপারে বিড়বিড় করতেন তিনি। শোনা যায়, নিদ্রিত অবস্থায়ও দর্শনের মতবাদ সংক্রান্ত অনেক জটিল সমস্যার মীমাংসা করতে সক্ষম হয়েছিলেন ইবনে সিনা।

অ্যারিস্টটলের *মনোবিজ্ঞান* চল্লিশবার পড়েছিলেন তিনি পয়লা দফায়। কিন্তু অমন কঠিন বইয়ে দাঁত ফোটাতে না-পেরে নিজের ওপর আস্থা হারিয়ে ফেলেছিলেন প্রায়। যে বই চল্লিশবার পড়ে মুখস্থ হয়ে গেছে, তার বক্তব্য না-বোঝা সত্যি খুব মর্মান্তিক ব্যাপার। যাহোক, বোখারার বইপাড়ায় ঘুরতে ঘুরতে ইবনে সিনা একদিন অভাবিতভাবে পেয়ে গেলেন এক আশ্চর্য বই। দোকানি হেঁকে হেঁকে বইটি বিক্রি করছিল। কৌতূহলী হয়ে এগিয়ে গেলেন ইবনে সিনা। তবে বইটি খোদাতত্ত্ব বিষয়ক—এ-কথা শুনে তিনি বললেন, এ বইয়ের কোনো দরকার নেই আমার। কিন্তু পুস্তক বিক্রেতা নাছোড়বান্দা। সে বিনীতভাবে বলল, হুজুর, এ বইয়ের লেখক খুব গরিব। কিন্তু বইটা মোটেই গরিব নয়। এত অল্প দামে এমন একখানা মূল্যবান বই আপনি আর কোথাও পাবেন না। দয়া করে একখানা বই কিনে নিয়েই দেখুন। দোকানির পীড়াপীড়িতে বইখানা হাতে তুলে নিয়েই তো ইবনে সিনা অবাক! আরে, এরকম একটা বই-ই তো তিনি খুঁজে বেড়াচ্ছিলেন অ্যাদ্দিন।

বইটি ছিল বিখ্যাত দার্শনিক আবু নসর আল-ফারাবির 'মাবা আদাত তাবা আ' বা অ্যারিস্টটলের ভাষ্য। ইবনে সিনা তিন দিরহাম দাম দিয়ে তক্ষুনি তা কিনে নিলেন। বলা দরকার, প্রাচ্যদেশীয় দার্শনিকদের মধ্যে আল-ফারাবিই সর্বপ্রথম অ্যারিস্টটলের মতবাদ নিয়ে আলোচনা করেন। 'মাবা আদাত তাবা আ'-য় তিনি খুব সহজবোধ্য ভাব ও ভাষায় তুলে ধরেছিলেন অ্যারিস্টটলের কঠিন বক্তব্যগুলো। বইখানা কিনে নিয়েই বাড়ি ফিরে গেলেন ইবনে সিনা। আর প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই পড়তে বসলেন। সব রহস্য তাঁর কাছে সহজ হয়ে এল। অ্যারিস্টটলের কূট মতবাদ অ্যাদ্দিনে তাঁর কাছে ধরা দিল সহজ ভঙ্গিতে।

অনেকে মনে করেন, দর্শনে ইবনে সিনা ফারাবিকে ডিঙিয়ে বিশুদ্ধ অ্যারিস্টটলবাদীতে পরিণত হন। কিন্তু এ বক্তব্য খণ্ডন করে অনেকেই আবার বলেন, তিনি কোনো বিশেষ মতবাদের কাছে আত্মসমর্পণ করেননি। বরং নিজের চিন্তাভাবনাকে গুরুত্ব দিয়েছেন। আর হয়তো এ কারণেই একদিন প্রাচ্যের শ্রেষ্ঠ দার্শনিকে পরিণত হন ইবনে সিনা। তিনি অনুকারী বা উদ্ধৃতি-সর্বস্ব আদপেই ছিলেন না। সংকলিত উপাদানগুলোকে পরিমার্জিত করে তিনি পরিপাটিভাবে তা পরিবেশন



www.pathagar.com

করেছেন। এক কথায়, দর্শনের জটিল মতবাদগুলোকে সংক্ষেপে বর্ণনা করার ক্ষেত্রে তিনি এক আদর্শ স্থাপন করেছিলেন।

ইবনে সিনা নৈয়ায়িক-জ্ঞানের গুরুত্বের কথা বারবার উল্লেখ করে গেছেন। তিনি বলতেন, শুদ্ধতম বোধ আসে স্বাভাবিক সত্তা আর সহজ বস্তুনিচয়ের মধ্য থেকেই। এবং এই বোধ চট করেই বদলে যায় না। 'অবিভাজ্য এক থেকে মাত্র একের উদ্ভাবনাই সম্ভব'— এই জটিল মতবাদ প্রতিষ্ঠিত করতে গিয়ে খুব কষ্ট করতে হয়েছিল ইবনে সিনাকে। তিনি বলেছেন, সৃষ্টি থেকেই স্রষ্টার অস্তিত্ব প্রমাণের চেষ্টা করা উচিত নয়। বরং পৃথিবীতে যা-কিছু বিরাজমান, তা থেকেই প্রথম এবং অপরিহার্য সত্তার অস্তিত্বের কথা সিদ্ধান্ত করে নিতে হবে। সেই সত্তাটির বিশেষত্ব হল একত্বে।

ইবনে সিনার এই মতবাদ সেকালের মুসলমানদের মনে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। ওই সময়ে মুতাজিলা সম্প্রদায়ের লোকেরা প্রচার করছিল যে— খোদা কেবল মঙ্গলই করেন, তিনি অমঙ্গলজনক কিছু করতে পারেন না। তবে ইবনে সিনা বললেন, পৃথিবীতে ভালোমন্দ যা-কিছু ঘটছে, তার সবকিছু কেবল খোদার আদেশেই হতে পারে। আর এরকম হওয়াই ভালো। কেননা, অন্ধকার না থাকলে যেমন আলোর মহিমা বোঝা যেত না, তেমনি অমঙ্গল ছাড়া মঙ্গলের মাহাত্ম্যই-বা মানুষ কীভাবে বুঝত? এর চেয়ে সুন্দর ব্যবস্থা আর কী হতে পারে!

## চার

পদার্থবিদ্যায় ইবনে সিনার মতামত সে-সময়কার প্রচলিত মতামতের ঊর্ধ্বে ওঠেনি। কিন্তু এখানেও দেখা গেছে তাঁর অসাধারণ বিশ্লেষণ-ক্ষমতার অপূর্ব নিদর্শন। বিস্ময়ের ব্যাপার, পদার্থবিদ্যার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয় জড়িমা (inertia) সম্বন্ধে তাঁর থিওরি এখনকার ধ্যানধারণার প্রায় কাছাকাছি। এ-ব্যাপারে অ্যারিস্টটলের শিক্ষা হল, 'কোনো বস্তুর গতি একটি উপযুক্ত কারণের সতত কাজের মাধ্যমেই নির্ধারিত হয়ে থাকে।' কিন্তু এভাবে কোনো প্রক্ষিপ্ত পদার্থের গতিবিধির সম্পূর্ণ বিশ্লেষণ সম্ভব নয়। ইবনে সিনাই প্রথম আরব বিজ্ঞানী, যিনি এ-সম্পর্কে গবেষণা করেন এবং এর প্রাঞ্জল ও পূর্ণাঙ্গ ব্যাখ্যা দেন। এই গতিবেগের গাণিতিক পরিমাপ বের করে তিনি দেখাতে চান, বেগ বা শক্তি যদি এক হয়, প্রক্ষিপ্ত বস্তুগুলোর বেগ হবে তাদের ওজনের বিষম অনুপাত অনুসারে। ষষ্ঠ শতাব্দীতে আলেকজান্দ্রিয়ার জন ফিলিপিনোস এ-ব্যাপারে যে-বক্তব্য রাখেন, তার বিরোধিতা করেন ইবনে সিনা। তিনি বলেন, শূন্যে সঞ্চরণশীল বস্তুর গতিপথে যদি কোনো বাধা না আসে, তাহলে প্রক্ষিপ্ত বস্তুটি অনন্তকাল চলতে থাকবে। দৃষ্টি সম্পর্কেও


www.pathagar.com

(Vision) গ্রিক মতবাদ অগ্রাহ্য করেন ইবনে সিনা। তাঁর *De Anima*-তে রয়েছে মনন-বিদ্যা ও আত্মা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা। অবশ্য তাঁর 'আল ইশরাত ওয়াত তান বিহাত' সম্পূর্ণ অন্যরকম বই। বিভিন্ন বিষয়ে গ্রিক দার্শনিকদের সঙ্গে নিজের মতপার্থক্য তিনি নানা যুক্তির মাধ্যমে এখানে তুলে ধরেছেন।

ইবনে সিনা মনে করতেন, বস্তুর শরীর কোনোকিছু করতে পারে না। যা-কিছু ঘটে, তাদের প্রত্যেকের পেছনেই থাকে একটি শক্তি। এই শক্তিকে আবার তিনভাগে ভাগ করেছেন তিনি— প্রকৃতির শক্তি, উদ্ভিদ বা জীবজন্তুর শক্তি এবং মানবাত্মা। মানবপ্রকৃতি সম্পর্কে তাঁর মতবাদকে বলা হয়েছে দ্বিত্ববাদ। তাঁর মতে আত্মা এবং শরীরের মধ্যে তেমন কোনো সম্বন্ধ নেই। বরং সবকিছুই উঠে আসে মূল উপাদানগুলোর সংমিশ্রণ থেকে। এর সঙ্গে রয়েছে গ্রহাণুপুঞ্জের প্রভাব। মানুষের দেহ গড়ে ওঠে এভাবেই। তবে মূল উপাদানগুলো এখানে সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ। এগুলোর আপেক্ষিক পরিমাণও খুব সূক্ষ্ম ও সুশৃঙ্খল। শরীরের স্বতোদ্ভাব সম্ভব; কিন্তু আত্মার বেলায় এ নিয়ম খাটে না। আত্মা গোড়া থেকেই আলাদা ও স্বতশ্চল।

দার্শনিক-চিকিৎসক ইবনে সিনা যে কবিও ছিলেন, তা জেনে অবাক হতে হয়। যেমন ওমর খৈয়ামের ব্যাপারটা। অনেকেরই হয়তো-বা জানা নেই যে, ওমর খৈয়াম আদতে ছিলেন একজন বিজ্ঞানী। কিন্তু শেষপর্যন্ত তাঁর কবি-পরিচিতিই বড় হয়ে উঠেছে। ঠিক তেমনি, চিকিৎসক ইবনে সিনা ছাড়িয়ে উঠেছেন নিজের অন্য সব পরিচয়কে।

ইবনে সিনা যে কবিতা লিখতেন, সে কথা জানা গেছে অনেক পরে। গবেষকরা বহু কষ্টের পর তাঁর লেখা কিছু আরবি ও পারসি কবিতার খোঁজ পেয়েছেন। এখানে একটা কথা বলা দরকার যে, ইবনে সিনার মাতৃভাষা পারসি হলেও তাঁর প্রায় সবগুলো বই-ই আরবিতে লেখা। পারসিতে লেখা তাঁর পনেরটি ক্ষুদ্র কবিতার খোঁজ প্রথম পান ডা. এথি। এর মধ্যে বারোটি চতুষ্পদী শ্লোক, একটি গজল ও দুটি হল বয়েতের অংশ। এগুলোর সর্বমোট চরণের সংখ্যা হবে চল্লিশ। কবিতাগুলো ডা. এথির মাধ্যমে জার্মান ভাষায় অনূদিত হবার পর অন্যান্য ভাষাতেও এগুলোর তর্জমা হয়েছে। মজার ব্যাপার এই, উল্লিখিত কবিতাগুলোর ভেতর থেকে একটি কবিতা ওমর খৈয়ামের কবিতা হিসেবে প্রায় প্রতিষ্ঠা পেয়ে গেছে। ফিটজেরাল্ড আর হুইপ ফিল্ডের অনুবাদে এই কবিতা ওমর খৈয়ামের বলেই সংগ্রথিত হয়েছে। ডা. এথি অবশ্য প্রমাণ করে ছেড়েছেন যে, লেখাটি ইবনে সিনার— ওমর খৈয়ামের নয়। বিশিষ্ট গবেষক এম. আকবর আলী সেই বিতর্কিত কবিতাটির বাংলা অনুবাদ করেছেন এভাবে :

পৃথিবীর ধূলি হতে আকাশের সপ্তদ্বার ভেদি
শয়তান রচেছে যেথা আপনার গর্বভরা বেদি


www.pathagar.com

উঠেছিনু সেথা আমি, পথিমধ্যে এক এক করে
মীমাংসা করেছি সব আছে যত গ্রন্থি বাঁধা ডোরে
কেবল পারিনি তারে— রহস্য দুর্জ্ঞেয় চিরকাল
মানুষের মৃত্যু আর জীবনের ভাগ্যলিপি জাল।

ইবনে সিনার আরবিতে লেখা কবিতাগুলোয় পাওয়া যায় তাঁর দার্শনিক ভাবনার পরিচয়। নিজের মতবাদকে তিনি এখানে রোমাঞ্চকর কাহিনীর ছাঁচে ঢেলে প্রচার করেছেন। এরকম দুটি কবিতা হল— 'হাই ইবনে ইয়াকজানের কাহিনী' এবং 'সোলায়মান ও আফজালের কাহিনী'। তবে তাঁর এই দর্শন বইয়ের চাইতে শিষ্যদের মাধ্যমেই বেশি ছড়িয়েছে। ইবনে সিনার মতবাদ সম্পর্কে ধারণা রাখা ষোড়শ শতাব্দী পর্যন্ত বিশ্বের সুধীমহলে একধরনের রীতিতে পরিণত হয়েছিল। এখানে তাঁর দুই ঘনিষ্ঠ সহচর জুজদানি ও আবুল হাসান বাহমনিয়ারের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করার মতো। জুজদানি তাঁর নিজের জীবনকথায় গুরু ইবনে সিনার জীবনীও জুড়ে দিয়েছেন অনেকখানি। আসলে তাঁর মতবাদ আর ইবনে সিনার মতবাদের মধ্যে কোনো পার্থক্য ছিল না। বাহমনিয়ার দর্শন ও বিজ্ঞান বিষয়ে কয়েকটি বই লিখেছিলেন। এখানে তিনি ইবনে সিনার অনুকারী ছিলেন মাত্র।

## পাঁচ

একাদশ শতাব্দীকে বলা হয়েছে মুসলিম সভ্যতা ও কৃষ্টির ইতিহাসে এক সোনালি যুগ। সপ্তম শতাব্দীতে দর্শন, বিজ্ঞান, সাহিত্য ও সংস্কৃতিকে কেন্দ্র করে মুসলমানদের যে অগ্রযাত্রা শুরু হয়েছিল— একাদশ শতাব্দীতে তা এসে পৌঁছে উন্নতির এক চরম শিখরে। কিন্তু তারপর?

এখানে এসেই আর কোনো জবাব মেলে না। জবাব মিলবেই-বা কী করে। ঠিক এখানে এসেই যে থেমে গেছে গোটা ক্যারাভান! আর তার পরেই শুরু হয়েছে পতন। ইসলামের রাজনৈতিক আকাশ তখন অন্ধকারে ঢাকা। এককালের গৌরবময় বাগদাদ পরিণত হয়েছে পারস্য তথা মুসলিম রাজ্যের নামেমাত্র রাজধানীতে। তার মর্যাদার সূর্য তখন অস্তাচলের পথে। পারস্যের নানা জায়গায় গজিয়ে উঠেছে নানা বংশের নানারকম শাখা-প্রশাখা। তারা এখানে-ওখানে গড়ে তুলছে এক-একটি রাজ্য। সামানীয় বংশের নৃপতিরা তো সেই দশম শতাব্দীর মাঝামাঝি থেকেই দাপটের সঙ্গে রাজত্ব করে আসছিলেন বোখারায়। কিন্তু কালের করাল গ্রাসে পড়ে খর্ব হয়েছে তাঁদের প্রভাবও। পারস্যের দক্ষিণ এবং পশ্চিমাঞ্চলে প্রবল প্রতাপে শাসনকাজ চালিয়ে যাচ্ছেন বুয়াইহ দোলামাইয়ী শাসকেরা। বাগদাদ মূলত তাঁদেরই


www.pathagar.com

করতলগত। সেখানকার যিনি খলিফা; তিনি আসলে দোলামাইয়ীদের হাতের পুতুল। রাজনৈতিক কূটকৌশলের আশ্রয় নিয়ে তাঁরা নিজেদের কোনো লোককে খলিফা না করে যাঁকে-খুশি-তাঁকে বসিয়ে দিচ্ছেন নামসর্বস্ব খলিফার আসনে। বুয়াইহ দোলামাইয়ী ছাড়া আরো দুটি বংশ এ-সময় নিজেদের প্রাধান্য বিস্তার করে চলেছে। তাবারিস্তানে রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছেন জিয়ার বংশীয় নৃপতিরা। আর হাসানিয়রা কুর্দিস্তান কবজা করে নিজেদের শক্তিমত্তার পরাকাষ্ঠা দেখাচ্ছেন।

পারস্যের গৌরবসূর্য যখন অস্তাচলগামী, সে-দেশের পূর্বপ্রান্তে তখন দেখা দিয়েছে নতুন আলোর ছটা। আফগানিস্তানে নতুন রাজ্য স্থাপন করেছেন এক মুক্ত-ক্রীতদাস। তাঁর অসাধারণ শৌর্যবীর্যের খবর ছড়িয়ে পড়েছে দিকে দিকে। এই নতুন রাজ্যের সঙ্গে যথারীতি ঝগড়া লেগে গেছে সামানীয়দের। কিন্তু পরাক্রমশালী সুলতান মাহমুদের সঙ্গে তাঁরা এঁটে উঠবেন কেন? তাঁদের সৈন্যরা বেধড়ক মার খাচ্ছিল সুলতানের দুর্ধর্ষ ফৌজের হাতে।

ত্রয়োদশ শতাব্দীর শুরুতেই খোরাসান দখল করে নিয়েছেন সুলতান মাহমুদ। কেবল বীরত্ব নয়; তাঁর বিস্ময়কর মেধাবলেই গজনি একদিন হয়ে উঠেছিল গোটা দুনিয়ার সাংস্কৃতিক কেন্দ্র। বাগদাদের মহিমা যেন গজনিতে স্থানান্তরিত হল। আরবি ভাষা ও সংস্কৃতির প্রাধান্য ক্ষুণ্ন করে সেখানে প্রভাব বাড়তে থাকে পারসি ভাষা ও রীতিনীতির। অবশ্য গজনির এ গৌরব বেশিদিন স্থায়ী হয়নি। মুহূর্তে আকাশে উঠে যাওয়া আতশবাজির মতো জ্বলে উঠেই তা যেন দপ করে নিভে গেছে। মাহমুদের ছেলে মাসউদ একাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি নাগাদ পরাস্ত হন সেলজুকদের হাতে। আর তখন ওই সেলজুকরাই আস্তে আস্তে সমস্ত মুসলিম রাজ্যের ওপর প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করে।

মুসলমানদের এই উত্থান-পতনের দিনে যে-কজন মনীষী তাঁদের অসামান্য প্রতিভায় সারা দুনিয়াকে চমকে দিলেন, আবু আলী হোসায়েন ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে সিনা তাঁদের অন্যতম। প্রধানতম তো বটেই।

## ছয়

বেশিরভাগ বিশিষ্ট মানুষের প্রথমজীবন থাকে দারিদ্র্যপীড়িত। আর পরে যে তাঁদের খ্যাতি, অর্থ ও প্রভাবের কোনো অভাব থাকে না, তা কে না-জানে। এর মধ্যে ব্যতিক্রমও অবশ্য আছে। কিন্তু তেমন ঘটনা অল্পই ঘটে।

ইবনে সিনার মধ্যে এই সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম লক্ষ করা যায়। প্রতাপশালী দেওয়ানের ঘরে, সোনার চামচ মুখে নিয়ে তাঁর জন্ম। সময়টা ছিল স্থিতিশীল। কোনো প্রাকৃতিক, সামাজিক বা রাজনৈতিক দুর্যোগ ইবনে সিনার প্রথমজীবনে ছায়া



www.pathagar.com

ফেলেনি। অতুল ঐশ্বর্য ও আদরের মধ্যে আস্তে অস্তে বেড়ে উঠেছেন তিনি। ফলে বিত্তবান পরিবারের বিলাসী ছেলের জীবনযাপনেই তিনি অভ্যস্ত ছিলেন। আর এই বিলাসিতা এমনই মজ্জাগত ছিল যে— শিক্ষা, সংস্কৃতি, দর্শন ও বিজ্ঞানের প্রতি প্রচণ্ড আগ্রহও তাঁকে সেই মোহ থেকে নিষ্কৃতি দেয়নি। অনেকেই মনে করেন, বেপরোয়া জীবনযাপনের কারণেই অপরিণত বয়েসে তাঁর মৃত্যু ঘটে।

কিন্তু জাঁকজমকের মধ্যে বেড়ে উঠলেও ইবনে সিনার শিক্ষানুরাগ ছিল অটুট। তাঁর আশ্চর্য স্মৃতিশক্তি সম্পর্কে নানারকম বিস্ময়কর কাহিনী চালু ছিল। কিন্তু মেধাবী ও শিক্ষানুরাগী এই ছেলেটিই যে একদিন সারাবিশ্বের শিক্ষক হিসেবে সম্মানিত হবেন, তা কেউ কল্পনাও করেনি সেদিন।

তখনকার নিয়মমতো ইবনে সিনার হাতেখড়ি হয় গৃহশিক্ষকের কাছে। শুরুতে সাধারণ ধর্ম বিষয়ে জ্ঞানলাভ করেন তিনি। এ সময় কোরআন ও আরবি কবিতাই ছিল প্রধান পাঠ্য-বিষয়। সেইসঙ্গে তাঁকে পড়তে হয় ব্যাকরণ, শরিয়ত ও ধর্ম সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য নানা খুঁটিনাটি। আরবি ভাষায় পড়াশোনা শুরু করলেও ইবনে সিনা কিন্তু আরব নন। তিনি ছিলেন বিশুদ্ধ পারসিক। কিন্তু সময়টা তখন এরকম যে, আরবি ভাষাই হয়ে উঠেছিল ওই অঞ্চলের প্রধান ভাষা। কেবল ও-এলাকাতেই নয়; তখনকার দিনে মুসলিম বিশ্বের একমাত্র বরণীয় ভাষাই ছিল আরবি। পারসি ভাষা তখন নানাভাবে মার খেতে খেতে কোণঠাসা অবস্থায় আছে। আর সে ভাষা ইবনে সিনার পারিবারিক ভাষা হলেও অভিজাতদের ভাষা হিসেবে আরবিকেই তাঁরা মেনে নিতে বাধ্য হয়েছেন।

শিক্ষার প্রাথমিক পর্বটি চুকে গেলে দর্শনশাস্ত্র বিষয়ে বেশিরকম মনোযোগী হয়ে ওঠেন ইবনে সিনা। এর পর সেকালের নামকরা চিকিৎসক হোসায়েন বিন নুহ আল কামরীর কাছে চিকিৎসাবিদ্যার পাঠ নিলেন তিনি। আর এ-ক্ষেত্রেও নিজের অধ্যবসায় আর মেধার পরিচয় দিয়ে দেখতে দেখতে হয়ে উঠলেন শিক্ষকদের পরম প্রিয় পাত্র। ছাত্রের গুণপনায় শিক্ষক এমন মুগ্ধ হন যে অন্যান্য শিক্ষকদের কাছে ইবনে সিনার প্রতিভা সম্পর্কে প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠতেন তিনি। শুনলে অবাক হতে হয় যে, মোটে আঠার বছর বয়েসেই ইবনে সিনা একজন গুণবান চিকিৎসক হিসেবে খ্যাতিমান হয়ে ওঠেন। এই খ্যাতি এতটাই ছড়িয়ে পড়ে যে, দূরদূরান্ত থেকে রোগীরা তো বটেই; অভিজ্ঞ ও স্বনামধন্য চিকিৎসকরাও তাঁর বুদ্ধি-পরামর্শ নিতে আসতেন। এত অল্প বয়েসে এরকম খ্যাতি লাভের পেছনে কারণও আছে বৈকি। ইবনে সিনা বুদ্ধিমান এবং পরিশ্রমী ছিলেন। আর এরই সঙ্গে যোগ হয়েছিল তাঁর ঔদার্য আর নম্রতা। চিকিৎসাশাস্ত্রের পাঠ নেবার পর পরই তিনি রোগী দেখতে শুরু করেন। ডাক্তারি শিখে রোগী দেখায় আশ্চর্য হবার মতো কীই-বা আছে! সবাই তো তাই করে। কিন্তু এখানে রয়েছে খানিকটা ব্যতিক্রম। এই নবীন চিকিৎসক গোড়ার



www.pathagar.com

দিকে রোগীদের কাছ থেকে কোনোরকম পয়সাকড়ি নিতেন না— হোক সে রোগী গরিব কিংবা ধনী। এতে দুদিক দিয়ে তিনি লাভবান হয়ে উঠতে থাকেন। প্রথমত খ্যাতিবিস্তারের মাধ্যমে তাঁর পশারের পথটা ক্রমেই সুগম হয়ে উঠতে থাকে; দ্বিতীয়ত হাতে-কলমে কাজ করতে করতে চিকিৎসাক্ষেত্রে তাঁর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাও বাড়তে থাকে। এখানে একটা কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করা দরকার যে, কেবল রোগী দেখা শুরু করেই নয়— শেষ বয়েসেও তিনি বিনে পয়সায় বহু রোগীর চিকিৎসা করেছেন।

চিকিৎসক হিসেবে ইবনে সিনার খ্যাতি কেবল সাধারণ মানুষের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে নি; রাজন্যবর্গের দরবারেও তা অবলীলাক্রমে পৌঁছে যায়।

খোরাসান তখন শান-শওকতে ভরা এক সুখী রাজ্য। সামানিয় বংশের দ্বিতীয় নুহ সিংহাসনে আসীন। শিক্ষার প্রতি গভীর অনুরাগ ছিল সামানীয় নৃপতিদের। মূলত তাঁদের অবদানেই বোখারা হয়ে উঠেছিল গোটা পারস্যের সাংস্কৃতিক পীঠস্থান। দ্বিতীয় মনসুর এবং তাঁর ছেলে দ্বিতীয় নুহের শাসনামলে সামরিক, মানসিক, শিল্প, সাহিত্য, বিজ্ঞান ও দর্শনের দিক থেকে খোরাসান হয়ে ওঠে সমগ্র মুসলিমবিশ্বের কেন্দ্রস্থল।

বাবা মনসুরের মতো ছেলে দ্বিতীয় নুহও গুণীর কদর করতেন। রাজনীতিকদের চেয়ে বিদ্বানরা তাঁর কাছে কম সমাদর পেতেন না। চিকিৎসক হিসেবে ইবনে সিনার খ্যাতি তাঁর কাছেও পৌঁছে গিয়েছিল ঠিকই; কিন্তু বয়েসটাই হয়ে দাঁড়িয়েছিল ইবনে সিনার বড় বাধা। বয়েস খুব কম হওয়ার কারণেই তিনি দ্বিতীয় নুহকে আকৃষ্ট করতে পারেননি সেদিন। ফলে তখনো পর্যন্ত রাজদরবারে সমাদর হয়নি তাঁর।

কিন্তু তাতে কী আসে-যায়। ইবনে সিনার অগ্রযাত্রা এতে থেমে থাকেনি। কেননা, তিনি ছিলেন ধনীর বাড়ির আদুরে ছেলে। নেহাত ঘটনাচক্রেই তাঁর সামনে খুলে যায় সৌভাগ্যের সোনালি দরজাটি। এ-সময় খলিফা আক্রান্ত হন এক কঠিন ব্যাধিতে। এমন জটিল সে রোগ যে দরবারের বাঘা-বাঘা চিকিৎসকরাও খলিফাকে সারিয়ে তোলার ব্যাপারে হিমশিম খাচ্ছিলেন। তাঁদের নানারকম মোক্ষম চিকিৎসাপদ্ধতিও ব্যর্থ হয়ে যাচ্ছিল। আর ঠিক সেই সময়েই ডাক পড়ল এই নব্য ধন্বন্তরির। সবেমাত্র আঠার বছরে পা দিয়েছেন ইবনে সিনা। কিন্তু মধ্যযুগীয় সেই দাম্ভিক নরপতির কক্ষে পা দিতে তাঁর একটুও বুক কাঁপল না। অগাধ আত্মবিশ্বাস নিয়ে তিনি চিকিৎসা শুরু করলেন খলিফার। এবং কী আশ্চর্য— খুব কম সময়ের মধ্যেই সেরে উঠলেন খলিফা! এই প্রথম উন্নতির সূচনা হল ইবনে সিনার জীবনে। পথের মাঝখানে যে বাধার দেয়ালগুলো দাঁড়িয়ে ছিল, তা এই ঘটনার মধ্য দিয়ে অপসারিত হল।



www.pathagar.com

বিমুগ্ধ দ্বিতীয় নুহ বললেন, তোমার অদ্ভুত হাতযশে আমি বিস্মিত। আর কত যে খুশি হয়েছি, তা বলে বোঝানো যাবে না। এখন বল, তুমি কী পুরস্কার চাও। যা চাইবে, তাই পাবে।

ইবনে সিনা শান্তভাবে জবাব দিলেন, আমি আপনার অমূল্য বইপত্রে-ভরা গ্রন্থাগারের সুনাম শুনেছি। যদি অনুগ্রহ করে সেই গ্রন্থাগারে অধমকে প্রবেশ করার অনুমতি দেন।

খলিফা মৃদু হেসে বললেন, তুমি যখন খুশি, যতক্ষণ ইচ্ছে— ওই পাঠাগারে বসে বই পড়তে পার। মনে রেখো, একমাত্র আমি ছাড়া ওখানে ঢুকবার অধিকার আর কারো নেই। এবার থেকে ওই লাইব্রেরির দরজা তোমার জন্যে খোলা।

বিদ্যোৎসাহী পূর্বপুরুষ ও নিজের মনোযোগের মাধ্যমে খলিফা এমন এক দুর্লভ পাঠাগার গড়ে তুলেছিলেন, যার তুলনা মেলা ভার। সেখানে এমন সব দুষ্প্রাপ্য বই ছিল, যা সেকালের পণ্ডিতদের মধ্যেও অনেকেরই চোখে পড়েনি। নৃপতিদের নিজস্ব ব্যবহারের জন্যে তিলতিল করে গড়ে ওঠা এই জ্ঞানভাণ্ডার অ্যাদ্দিন ছিল লোকচক্ষুর অন্তরালে। সেখানে প্রবেশাধিকার পেয়ে ইবনে সিনার মনপ্রাণ ভরে গেল অজস্র আনন্দে। তিনি নিবিষ্ট মনে শুরু করলেন অধ্যয়ন। অল্পদিনের মধ্যে ইবনে সিনা পড়ে শেষ করলেন কুতুবখানার তাবৎ কেতাব। এখানে পড়াশোনার সুযোগ পাবার পর তাঁর বেশিরভাগ সময় কেটে যেত খোলা বইয়ের সামনে বসে।

কিন্তু অভাবিত এক ঘটনা রাজগ্রন্থাগারের সঙ্গে ইবনে সিনার ছেদ টেনে দেয়। কী কারণে কে জানে, একদিন হঠাৎ করে আগুন লেগে যায় পাঠাগারে। সমস্ত দুষ্প্রাপ্য বইপত্র পুড়ে একেবারে ছাই। তখন শত্রুরা রটিয়ে দেয় যে, এখানকার সবগুলো জরুরি বই পড়া শেষ হয়ে যাবার পর ইবনে সিনা নিজে এ পাঠাগারে অগ্নিসংযোগ করেছেন। তারা এরকম যুক্তি দেখায় যে, ওই জ্ঞানসমুদ্রে অন্য কারো অবগাহনের সুযোগ নষ্ট করে দেয়ার উদ্দেশ্যেই তিনি অমন অমূল্য গ্রন্থরাজি ভস্মীভূত করেছেন। কিন্তু তিনিই যে ওই অগ্নিকাণ্ডের জন্যে দায়ী ছিলেন, তেমন কোনো জোরালো প্রমাণ শেষপর্যন্ত পাওয়া যায়নি।

অধীত বিদ্যার ফসল হিসেবে অচিরেই প্রকাশিত হয় ইবনে সিনার নিজস্ব গ্রন্থাবলি। এ-সময় তিনি একটি বিশ্বকোষ প্রণয়ন করেন, যাতে একমাত্র গণিতশাস্ত্র ছাড়া তখনকার দিনের বিজ্ঞান-সংশ্লিষ্ট যাবতীয় তথ্যের সমাবেশ ঘটে। এই বিশ্বকোষের মাধ্যমেই তাঁর অসামান্য বিদ্যাবত্তার খ্যাতি চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে। তাঁর প্রশংসায় মুখর হয়ে ওঠে গোটা পারস্য।

কিন্তু এই বইটির জন্যেই আবার একশ্রেণির লোক খাপ্পা হয়ে ওঠে ইবনে সিনার ওপর। আর সেইসঙ্গে যোগ হয় তাঁর জীবনের নানা ব্যক্তিগত দুর্যোগ-দুর্বিপাক। পারস্যের রাজনৈতিক গগন অনিশ্চয়তার মেঘে মেঘে ছেয়ে যায়। যখন বয়েস মাত্র



www.pathagar.com

বাইশ বছর, তখন তাঁর বাবা মারা যান। ফলে আবাল্য ঐশ্বর্যের মধ্যে লালিত যুবককে আকস্মিকভাবে এসে দাঁড়াতে হয় কঠোর বাস্তবের মুখোমুখি। আর্থিক অনটনে বিব্রত, হতবিহ্বল ইবনে সিনা এমন অনিশ্চয়তার মধ্যে পড়ে প্রমাদ গুনলেন। পিতার শোক ও অনটনের আঘাত সামলে উঠে তিনি যখন স্বাবলম্বী হয়ে ওঠার চেষ্টা শুরু করেছেন, সেই সময় নেমে এল আর-এক নতুন বিপদ। রাজনৈতিক সংঘাতের ফলে সামানীয় বংশের পতন ঘটল। আবার শুরু হল রক্তপাত আর ধ্বংসযজ্ঞ। এই সংঘাত-সংঘর্ষের সূত্রপাত ঘটে ভারতবিজয়ী সুলতান মাহমুদের হাতে। পিতার মৃত্যুর পর গজনির সিংহাসনে আরোহণ করেই তিনি বেরিয়ে পড়েন দিগ্বিজয়ে। তাঁর বিজয় অভিযানের আওতায় পড়ে যায় সামানীয় রাজ্য বোখারাও। এই বোখারাতেই ইবনে সিনার বাবা সারাটা জীবন অতিবাহিত করে গেছেন। ইবনে সিনা নিজেও এখানেই সম্মানিত ও প্রতিষ্ঠিত হন। অথচ রাজনৈতিক সহিংসতার কারণে আশৈশবের প্রিয় রাজ্য বোখারা থেকে চলে গেলেন খারিজমের রাজধানী কারকানজিতে।

সুলতান মাহমুদ গুণীর কদর করতেন। ইবনে সিনার মতো প্রতিভাদীপ্ত তরুণকেও হয়তো তিনি গ্রহণ করতে দ্বিধান্বিত হতেন না। কিন্তু ওই দিগ্বিজয়ীর সঙ্গে আলাপ-পরিচয় না-থাকায় ইবনে সিনা ঝুঁকি নিতে সাহসী হননি। তাছাড়া সুলতান মাহমুদের প্রতি তাঁর মনে একধরনের ঘৃণাও জেগে উঠেছিল খুব সম্ভব। কেননা, পরবর্তী সময়ে সুলতান মাহমুদ উপযাচক হয়ে ইবনে সিনাকে নিজের বিদ্বজ্জন সভার সম্মানিত সদস্য হবার আহবান জানালেও তিনি আগ্রহী হননি।

খারিজমের রাজধানী কারকানজিতে শুরু হল বাইশ বছরের প্রতিভাবান যুবক ইবনে সিনার সত্যিকার সংগ্রামী জীবন।

## সাত

চিকিৎসক হিসেবে অভূতপূর্ব সাফল্য জীবনের বহু প্রতিবন্ধকতা অতিক্রমে ইবনে সিনাকে বিস্ময়করভাবে সহায়তা করেছে। বর্তমান শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে এই কৃতী পুরুষের জন্ম-সহস্রবার্ষিকী উদ্‌যাপিত হয়েছে মহাসমারোহে। এই উৎসবের সময় তাঁর আশ্চর্য চিকিৎসাপদ্ধতি সম্পর্কে নতুনভাবে আবিষ্কৃত তথ্যাবলি উপস্থাপন করা হয়। সোভিয়েত লেখক ইউরি ক্রাভাৎসব তাঁর হাজার বছর আগের একটি ব্যবস্থাপত্র নিবন্ধে তুলে ধরেন এই উপাখ্যানটি :

> 'জ্ঞানী, বৃদ্ধ মানুষটি তখন মৃত্যুমুখে। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন, মৃত্যু ঠেকানো যাবে না। কারণ বয়েসের সীমা বহু আগেই তিনি ছাড়িয়ে এসেছিলেন। তাঁর মাথার চুল হয়ে



www.pathagar.com

উঠেছিল তুষারশুভ্র। কিন্তু মনটা ছিল বরাবরের মতো স্বচ্ছ। তাই যখন অনুভব করলেন সময় ফুরিয়ে আসছে, সবচেয়ে সক্ষম এবং অনুগত শিষ্যকে ডাকলেন। তারপর মৃত্যুর প্রভাবজনিত ক্ষীয়মাণ স্বরে বললেন, এই চল্লিশটি পাত্রে নিরাময়কারী উপকরণ আছে। যখন আমার হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে যাবে, একটির পর একটি পাত্র থেকে—ঠিক আমি যেভাবে বলছি— একটি পাত্রও যেন বাদ না যায়— ওষুধ নিয়ে আমার নিষ্প্রাণ দেহে মালিশ করবে।'

কথামতো কাজ করতে করতে তরুণ শিষ্য বিস্ময়ে বিহ্বল হলেন। তার চোখের সামনেই মহাজ্ঞানী বৃদ্ধের মৃতদেহে প্রাণ ফিরে আসতে লাগল এবং পলিতকেশ বৃদ্ধ যুবকে পরিণত হতে লাগলেন। বিস্ময়ের আধিক্যে শেষ বা চল্লিশতম পাত্রটি শিষ্যের হাত থেকে পড়ে গিয়ে ভেঙে গেল। তরল ওষুধ মেঝেতে গড়িয়ে গেল...।

লেখাটিতে ধরা পড়েছে মূলত ইবনে সিনারই অসাধারণ ক্ষমতা সম্পর্কে জনসাধারণের বিশ্বাসের গভীরতা। ইবনে সিনা প্রচলিত রীতি-পদ্ধতির বাইরেও চিকিৎসাক্ষেত্রে নানারকম পরীক্ষানিরীক্ষা করেছেন। ইবনে সিনা লিখেছেন— ঝাপসা দৃষ্টির চিকিৎসায় সবরকম পিত্তই ব্যবহৃত হতে পারে। শিকারি প্রাণীর পিত্ত চোখের ছানি ও চোখের তারার প্রসরণ রোধ করার চিকিৎসায় সহায়ক। অর্ধ-বধিরতা রোগের চিকিৎসায় জলপাই তেলের সঙ্গে শকুনের পিত্ত ব্যবহৃত হয়। চোখের শাদা অংশের বিস্তার রোধে ঠাণ্ডা পানির সঙ্গে মিশিয়ে এই ওষুধ প্রলেপরূপে ব্যবহৃত হতে পারে।

পামির অঞ্চলের ওষুধ-বিজ্ঞানীরা মনে করেন, ইবনে সিনা এই ব্যবস্থাপত্রগুলো গ্রাম্য-ওষুধ তৈরির পদ্ধতির নিরিখে প্রণয়ন করেছিলেন এবং কোনো-কোনো রোগের চিকিৎসায় এগুলো এখনো বিশেষ ফলপ্রসূ হতে পারে।

চিকিৎসা বিষয়ে তাঁর সর্বাধিক বিখ্যাত গ্রন্থ 'কানুন' সম্পর্কে আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। এ বইয়ের প্রথম খণ্ডে আছে শরীর ও স্বাস্থ্য সম্পর্কিত তত্ত্বের সাধারণ মূলনীতি। দ্বিতীয় খণ্ডের প্রথম ভাগে আলোচনা করা হয়েছে পরীক্ষানিরীক্ষা ও অনুমান সাপেক্ষে ওষুধের প্রকৃতি নির্ণয় ব্যবস্থা। কীভাবে ওষুধ সম্পর্কে গবেষণা করতে হবে, এতে তার দিকনির্দেশনাও রয়েছে। এই খণ্ডে ভেষজ ওষুধ ও তার কার্যকারিতা বর্ণিত হয়েছে। এখানে গ্যালেন এবং অ্যারিস্টটলের প্রভাব স্পষ্ট। এই খণ্ডের দ্বিতীয় ভাগে রয়েছে ৮০০ পরিচ্ছেদ। এতে উল্লিখিত ওষুধ ও গাছগাছড়াই বহুদিন ধরে এ বিষয়ে শেষকথা বলে বিবেচিত হত। এতে আবজাদ-প্রণালী অনুসারে, ডা. মাজহার শাহের মতে ৭৬০টি এবং ইউরি ক্রাভৎসবের মতে ৭৮৫টি ওষুধ নিয়ে আলোচনা রয়েছে। প্রতিটি ওষুধের পরিচয়, ব্যবহার বিধি, কার্যকারিতা এবং সে-সবের বিকল্প ওষুধ সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণও এর অন্তর্গত।



www.pathagar.com

কানুন-এর তৃতীয় খণ্ডে রয়েছে প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের রোগ ও তার চিকিৎসা সম্পর্কে আলোচনা। এর চক্ষুরোগ সম্পর্কিত অংশের জার্মান অনুবাদ ১৯০২ সালে বেরিয়েছে লাইপজিগ থেকে। Die Augenheilkunds des Ibn Sina নামে এ অংশটি প্রকাশ করেন হার্সবার্গ এবং লিপার্ট।

চারখণ্ডে বিভক্ত চতুর্থ খণ্ডের প্রথম ভাগে নানারকম স্বরের সাধারণ বর্ণনা, স্থিতিকাল, কারণ; এর সাধারণ ও বিশেষ ধরনের চিকিৎসা; এর সঙ্কটকালের বিবরণসহ নানা উপসর্গের চিকিৎসাপদ্ধতির কথা রয়েছে। দ্বিতীয় ভাগে আছে ফোঁড়া, ফোলা ও কুণ্ঠের ছোটখাটো অপারেশন; ঘা ও তার সাধারণ চিকিৎসা; আঘাতজনিত হাড়ভাঙা, স্থানচ্যুতি ও আলসার প্রসঙ্গ। তৃতীয় ভাগে আছে খনিজ, উদ্ভিজ্জ এবং জৈবিক পদার্থ থেকে বিষক্রিয়া, মানুষ ও জন্তুর কামড় বা আঁচড় থেকে বিষক্রিয়া। চতুর্থ ভাগে সৌন্দর্য, প্রসাধনী; শীর্ণ ও মেদবহুল শরীর, চুল, নখ, গাত্রচর্ম, বিরক্তিকর গন্ধ, বসন্ত রোগজনিত ক্ষতচিহ্ন ইত্যাদি চিকিৎসা। পঞ্চম খণ্ডে বিভিন্ন রোগের জন্যে ওষুধের ব্যবস্থাপত্র; বড়ি, পাউডার ও সিরাপ, ফুটিয়ে ক্বাথ বের করা, মোরব্বা বানানো, ওষুধের পরিমাণ নির্ধারণ করা ইত্যাদির বিবরণ রয়েছে।

যতদূর জানা যায়, ইবনে সিনা শব-ব্যবচ্ছেদ করেননি। এ ব্যাপারে তিনি খুব আগ্রহী ছিলেন না। রোগের ওপর ওষুধের কার্যকারিতা ও প্রকৃতির ওপর তার প্রভাব সম্বন্ধেই বিশেষ আগ্রহ ছিল তাঁর।

এসব বই লেখার সময় পূর্ববর্তী চিকিৎসাবিজ্ঞানীদের শরণাপন্ন হলেও তিনি মৌলিকতাবর্জিত অবশ্যই নন। দুজন অগ্রজের মতপার্থক্য দেখলে যুক্তি দিয়ে তিনি সমর্থন জানাতেন অন্যজনকে। গ্যালেন ও হিপোক্রেটসের অনেক মতবাদের তীব্র সমালোচনা করেছিলেন ইবনে সিনা। আবার পূর্ববর্তী অন্যান্য মনীষীর নানা মতবাদ সমর্থনও করেছিলেন তিনি। পুরনো দিনের চিকিৎসাবিজ্ঞানীদের ছড়ানো-ছিটানো মতবাদ একত্র করে তিনি স্বচ্ছ, সবল ও সুন্দর ভাষায় তা প্রকাশ করেন। সম্পূর্ণ নিজের মতবাদ ভিত্তি করে লেখা তাঁর কোনো বইয়ের সন্ধান পাওয়া যায় না।

ইবনে সিনা মানুষের বিভিন্ন মানসিক অবস্থা— যেমন ক্রোধ, দুশ্চিন্তা, আনন্দ, শোক এবং অন্যান্য অনুভূতি মানুষের হৃৎপিণ্ড ও রক্তের উপাদানের কাজের ওপর কীরকম প্রভাব বিস্তার করে, সে সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। তিনি দেখাতে চেষ্টা করেছেন যে মানুষের নৈতিক গুণাবলি আত্মার সঙ্গে যৌথভাবে হৃৎপিণ্ডের ওপর ক্রিয়াশীল থাকে। তাঁর মতে ওষুধ ব্যবহার করেই মানুষের নানা অনুভূতি— যেমন ঈর্ষা, দ্বেষ, সাহস, কাপুরুষতা, কার্পণ্য, দুঃখ, আনন্দ, দয়া, রাগ ইত্যাদি কমানো-বাড়ানো, এমনকি বদলানো যায়!

আগেই বলা হয়েছে যে হৃদরোগের চিকিৎসা সম্পর্কে ইবনে সিনা যে-বইটি লেখেন, তা ছিল সম্পূর্ণ মৌলিক। এই বইটির কথা তিনি *কানুন*-এর তৃতীয় খণ্ডে



www.pathagar.com

উল্লেখ করেছেন। খুব সম্ভব *কানুন*-এর সবগুলো খণ্ডের রচনা শেষ হবার আগেই তিনি এটি লিখেছিলেন। কোনো-কোনো গবেষকের মতে, কারামুক্তির পর শামস উদ দৌলার ছেলে ও মন্ত্রী তাজউল মুলকের আমন্ত্রণে হামাদান যাবার পর তিনি এই গ্রন্থটি রচনা করেন।

ইবনুল হিশাম দৃষ্টি সম্পর্কে যে মত প্রকাশ করেন, ইবনে সিনা তা অকুণ্ঠ চিত্তে মেনে নেন। এই মতবাদ পদার্থবিজ্ঞানের 'আলো' বিষয়ে নতুন থিয়োরির বৈজ্ঞানিক ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করে। তিনি জণ্ডিসের পার্থক্য সম্পর্কেও অবহিত ছিলেন। মেনিন-জাইটিস নিয়ে তিনিই প্রথম বিস্তারিত আলোচনা করেন।

হাতুড়ে ডাক্তারদের ওপর বিতৃষ্ণা ছিল ইবনে সিনার। তিনি চিকিৎসাবিজ্ঞানে জ্যোতির্বিদ্যা আমদানির সমালোচনা করেছেন। তবে এসব ব্যাপারে তাঁর বিপরীত মত পোষণকারীদের সংখ্যাও নেহাত অল্প ছিল না। নিজামির 'বাহার মাকালা' গ্রন্থে ইবনে সিনার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা রয়েছে। লেখকের মতে, "অন্যান্য গুণের সঙ্গে একজন চিকিৎসকেরও থাকা দরকার ধর্মভীরুতা। কোরআন ও হাদিসের মূল উপদেশগুলো হৃদয়ঙ্গম করা ছাড়াও তাঁর পড়া দরকার হিপোক্রেটসের 'ফুসুল', হুনায়েন ইবনে ইসহাকের মাসায়েল (প্রশ্নাবলি), মোহাম্মদ জাকারিয়া আর রাজির 'মুরশিদ' (পথ প্রদর্শক) এবং নীলির ভাষ্য। তারপর তিনি অধ্যয়ন করবেন সাবেত ইবনে কোরার 'দাখিয়া', আর রাজির 'কিতাবুততিব আল মনসুরি', আবু বকরের 'হাদিয়া', আহমদ ফাররুখের 'বিফায়া' এবং সৈয়দ ইসমাইল জুরজানির 'আগবাদ'। উল্লিখিত বইগুলো পড়ার পরে পুরো বিষয়টা বিশদভাবে জানাবার জন্যে নিম্নোক্ত যে-কোনো একটা বই পড়লেই চলবে : গ্যালেনের 'সিত্তা আসার' (ষোড়শ গ্রন্থ), আর রাজির 'হাওই' (সার সংগ্রহ), আবু সহল মসীহির 'কামিলুস সালায়াত' (পূর্ণ ব্যবসায়ী) বা 'সাদবাব' (শত প্রবন্ধ) ও আবু আলী ইবনে সিনার 'কানুন'। তবে ইবনে সিনার 'কানুন' বইটি যদি কেউ একবার হৃদয়ঙ্গম করতে পারে, চিকিৎসাবিজ্ঞানের আগাগোড়াই তার জানা হয়ে গেল। বিশ্বভুবনের প্রভু যেমন বলেছেন— 'সমস্ত প্রকার ক্রীড়াই বন্য গর্দভের গর্ভে আছে'— তেমনি 'কানুন' সম্বন্ধেও বলা যায়, এর মধ্যেই নিহিত আছে চিকিৎসাশাস্ত্রের সবকিছু। যদি হিপোক্রেটস ও গ্যালেন আবার বেঁচে উঠতে পারতেন, তাহলে চিকিৎসাক্ষেত্রে নিজেদের অনন্যসাধারণ প্রতিভা সত্ত্বেও তাঁরা 'কানুন'-এর মাহাত্ম্য মেনে নিতে বাধ্য হতেন। এরপরও যখন 'কানুন'-এর বিরূপ সমালোচনা শুনতে হয়, তখন আশ্চর্য লাগে। দুঃখের বিষয়, 'কানুন'-এর মতো অতুলনীয় বইটি নিয়েও কথা উঠেছে। একজন তেরিয়া স্বভাবের লোক তো 'কানুন'কে ধূলিসাৎ করার জন্যে 'আসলাহি কানুন' বা কানুন-এর সংশোধন নামে একটা বই পর্যন্ত বের করে ফেলেছে। আমি 'কানুন' এবং 'আসলাহি কানুন'— এই দুখানা বই-ই পড়েছি। কিন্তু 'আসলাহি কানুন' পড়ে লেখকের প্রতি



www.pathagar.com

আমার বিন্দুমাত্র আস্থাও বাড়েনি। বরং দুজনের মধ্যকার পর্বতপ্রমাণ পার্থক্যই আমার সামনে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। ইবনে সিনা বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী, আর তাঁর বিরুদ্ধবাদীটি বিদগ্ধজনের ঘৃণাই কেবল পেতে পারে। প্রাচীনকালের চিকিৎসকগণ চার হাজার বছরের আপ্রাণ প্রয়াসের পরও চিকিৎসা বিজ্ঞানকে সুবিন্যস্ত করতে পারেননি। এর পর এলেন অ্যারিস্টটল। তিনিই প্রথম একে শৃঙ্খলার মধ্যে এনে বিজ্ঞান হিসেবে একে প্রতিষ্ঠিত করেন। অ্যারিস্টটলের পরে পনের শো বছরের মধ্যে চিকিৎসাশাস্ত্রের তেমন উন্নতি হয়নি। তাঁর মতবাদ ভালোভাবে বুঝতে পেরেছিলেন একমাত্র ইবনে সিনাই। এই দুজন পণ্ডিতের অবদানের মধ্যেও যারা খুঁৎ ধরে, তারা জ্ঞানীগুণীদের সারিতে বসার যোগ্য নয়। বরং পাগলদের সংসর্গেই তাদেরকে ভালো মানাবে, নিদেনপক্ষে তারা পরিগণিত হবে নির্বোধ হিসেবে। আমরা যেন অমন অধঃপতিত আর বিকারগ্রস্ত না-হই!"

নিজামীর এহেন প্রশংসায় কিছুটা বাড়াবাড়ি থাকলেও, শেষ পর্যন্ত তাঁর বক্তব্য মেনে নিতেই হয়। মধ্যযুগে ইবনে সিনার প্রভাব যে গগনচুম্বী হয়ে উঠেছিল, তাতে আর কোনো সন্দেহ নেই।

## আট

নদীমেখলা শস্যশ্যামলা খারিজম। চারদিকে মধ্য-এশিয়ার রুক্ষ, ধূসর মরুভূমি। কিন্তু জইহুন নদীবিধৌত খারিজম যেন এক স্নিগ্ধ মরূদ্যান। মুসলমানদের অধিকারে আসবার পর থেকেই প্রদেশটি জ্ঞানে-বিজ্ঞানে ও সাংস্কৃতিক উৎকর্ষে গোটা দুনিয়ার দৃষ্টি আকর্ষণে সক্ষম হয়েছিল। তাছাড়া বাগদাদের বিস্ময়কর উন্নতির পেছনে খারিজম যে অবদান রেখেছে, তা সর্বজনস্বীকৃত। বীজগণিত ও জ্যোতির্বিদ্যা চর্চার অন্যতম প্রধান কেন্দ্র ছিল এই প্রদেশ। বীজগণিত বা অ্যালজেব্রার উদ্‌গাতা মোহাম্মদ বিন মুসা আল খারেজমির জন্ম এখানেই।

যেসব মনীষীর অবদানে বিশ্বসভ্যতা সমৃদ্ধ হয়েছে তাদের অনেকের জন্মই এ খারিজমে। ইসলামের উত্থানের পর থেকে মুসলমানদের গৌরব-রবি অস্তাচলগামী হবার পূর্ব পর্যন্ত প্রায় প্রতি শতাব্দীতেই এ মাটিতে জন্ম নিয়েছেন বহু স্বনামধন্য বিজ্ঞানী ও দার্শনিক।

খারিজমে এসে ইবনে সিনাকে কতদিন ভবঘুরের মতো জীবনযাপন করতে হয়, তা জানা যায়নি। তবে বেশিদিন তাঁকে কষ্ট করতে হয়নি বলেই মনে হয়। প্রথম দিকে ফকির সেজে তিনি খারিজম শাহের দরবারে যাতায়াত শুরু করেন। কিন্তু প্রকৃত প্রতিভাবান ব্যক্তি বেশিদিন আত্মগোপন করে থাকতে পারেন না। ছদ্মবেশধারী ইবনে সিনার পরিচয়ও একদিন ফাঁস হয়ে গেল সবার কাছে। বিদ্যোৎসাহী শাহের কাছে সমাদর হতেও দেরি হল না ইবনে সিনার।



www.pathagar.com

সে যুগের অন্যান্য মুসলিম শাসকদের মতো খারিজম শাহ আলী বিন মামুনও ছিলেন গুণগ্রাহী। তাঁর দরবারে সমাবেশ ঘটেছিল সেকালের সেরা পণ্ডিতদের। মন্ত্রী আবুল হাসান সহলী আহম্মদ বিন মুহাম্মদ ছিলেন দর্শনের প্রতি বিশেষভাবে আগ্রহী। দরবারের গৌরব বাড়াবার ব্যাপারে তিনিও কম চেষ্টা চালাননি। ফলে খারিজম রাজসভা জ্ঞানীগুণীর ভিড়ে ভরে উঠতে দেরি হয়নি। এর আগে বিশ্ববিশ্রুত পণ্ডিত আল বেরুনী খারিজম ছেড়ে জুরজান ও তাবারিস্তানে গিয়ে সেখানকার শাসক শামসুল মা' আলীর দরবারে যোগ দিয়েছিলেন। শাহ ও তাঁর মন্ত্রীর অনুরোধে আবার তিনি খারিজমে ফিরে এসে দরবারের গৌরব বৃদ্ধি করেন এবং তাঁর এই ফিরে আসার ব্যাপারে মন্ত্রী আবুল হাসানই পালন করেন এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। কেবল ফিরিয়ে আনাই নয়— এখানে ফিরে আসার পর তাঁর যশ ও প্রভাব বৃদ্ধির ব্যাপারেও হাসান গ্রহণ করেছিলেন ব্যক্তিগত উদ্যোগ। কৃতজ্ঞতাস্বরূপ ইবনে সিনাও নিজের লেখা দুখানা বই উৎসর্গ করেন আবুল হাসানকে। বই দুটি হচ্ছে 'কিতাবুল কিয়ামিল আরদে ফি বয়তেস সামা' বা পৃথিবীর শূন্যে অবস্থান বিষয়ক গ্রন্থ। একাদশ শতাব্দীর দুই উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক ইবনে সিনা ও আল বেরুনীর মধ্যে সাক্ষাৎ ঘটে এই খারিজমের শাহি দরবারেই। ক্রমে দুই দিকপালের মধ্যে সদ্ভাবও গড়ে ওঠে; কিন্তু পরস্পরের প্রতি ঈর্ষাও যে প্রচ্ছন্ন ছিল না— এমন নয়!

আল বেরুনী একদিন প্রাকৃতিক বিজ্ঞান সম্পর্কে আঠারটি বিষয়ে অ্যারিস্টটলের সমালোচনা লিখে কয়েকটি প্রশ্নসহ তা ইবনে সিনার কাছে পাঠিয়ে দেন। ইবনে সিনাও সে-সব প্রশ্নের জবাব দিয়ে দেন যথারীতি। কিন্তু সে-সব উত্তর আল বেরুনীর পছন্দ হয়নি। বরং তিনি 'ফতা' বা অপরিণত যুবক বলে ইবনে সিনার প্রতি তাচ্ছিল্য প্রদর্শন করলেন। আল বেরুনী ছিলেন ইবনে সিনার চেয়ে সাত বছরের বড়। তাঁর জন্ম হয় ৯৭৩ খ্রিস্টাব্দে। ইবনে সিনা এ অবহেলাকে হেসে উড়িয়ে দিলেও মনে মনে দুঃখিত হয়েছিলেন নিশ্চয়ই। এর প্রমাণ, পরবর্তী সময়ে এরকম কোনো প্রশ্নের জবাব ইবনে সিনা নিজের হাতে লিখতেন না। লেখাতেন ছাত্র আবু আবদুল্লাহ মাসুমকে দিয়ে।

ইবনে সিনা ও আল বেরুনীর মধ্যে কে বেশি প্রতিভাবান, এ নিয়ে নানাজনের নানা মত। কিন্তু তুলনাকারীরা ভুলে যেতেন যে দুজনের কাজের ধারা সম্পূর্ণ আলাদা। ইবনে সিনা ছিলেন মূলত দার্শনিক ও চিকিৎসক; আর আল বেরুনীর বিষয় ছিল বিজ্ঞানের গণিত ও ইতিহাস। আসলে দুজন প্রতিভাবানের মধ্যে কে বড় আর কে ছোট, তা নিখুঁতভাবে নিরূপণ করতে যাওয়া কষ্টকর ও নিরর্থক। তবে উভয়ের মধ্যে একটা ব্যাপারে ছিল আশ্চর্য মিল! তাঁরা দুজনেই প্রথম জীবনে শিক্ষার জন্যে প্রচুর কষ্ট স্বীকার করেন।



www.pathagar.com

দুঃখের বিষয়, খারিজমের পণ্ডিত-সভা দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। জমে উঠতে-না-উঠতেই তাতে ফাটল ধরে। এই দরবারের অসামান্য জ্ঞানীগুণীদের সমাবেশের খবর গজনির দিগ্বিজয়ী সুলতান মাহমুদের কানে গিয়েছিল। তিনি ঠিক করলেন, নিজের বিদ্বজ্জন সভাকে অতুলনীয় করে তুলতে হবে। যে চিন্তা, সেই কাজ ! তিনি আলী বিন মামুনের কাছে চিঠি লিখলেন— 'অনুগ্রহ করে আপনার দরবারে কয়েকজন সভাসদকে গজনি দরবারে পাঠিয়ে দিন।'

চিঠিখানা বয়ে নিয়ে এসেছিলেন সুলতান মাহমুদের অন্যতম দূত খাজা হোসেন আলী মিকায়েল। খারিজম শাহ মিকায়েলের যত্ন-আত্তির ত্রুটি করলেন না। সবচেয়ে ভালো আহার ও বিশ্রামের বন্দোবস্ত হল রাজদূতের জন্যে। ওদিকে বিদ্বান-সভার পণ্ডিতদের গোপনে ডেকে এনে সব কথাই খুলে বললেন আলী বিন মামুন।

আবু নসর, আবুল হাসান এবং আবু রায়হান আল বেরুনী ছাড়া অন্য সবাই প্রায় সমস্বরে বলে উঠলেন— আমরা আপনাকে ছেড়ে কিছুতেই গজনি যাব না। গজনি যাবার ব্যাপারে আবু সহল এবং ইবনে সিনার ঘোরতর আপত্তি দেখে খারিজম শাহ বললেন, আপনারা যদি সেখানে যেতে না চান, তাহলে সুলতানের দূতের সঙ্গে দেখা হওয়ার আগেই এ তল্লাট ছেড়ে পালিয়ে যান। নইলে আমি তো বিপদে পড়বই— বিপন্ন হবেন আপনারাও। তাঁরা পালিয়ে যেতে রাজি হলে খারিজম শাহ তাঁদের যাওয়ার বন্দোবস্ত করে একজন পথপ্রদর্শকও সঙ্গে দিলেন। ভয়ঙ্কর এক মরুভূমির মধ্য দিয়ে মাজান্দারান অভিমুখে রওনা হয়ে গেলেন ইবনে সিনা আর আবু সহল।

পরদিন রাজদূতকে ডেকে এনে খারিজম শাহ বললেন, আমি সুলতানের চিঠি পড়ে তাঁর আদেশ অবগত হয়েছি। আপনি আবু নসর, আবুল হাসান আর আবু রায়হান আল বেরুনীকে নিয়ে যান। তাঁরা সুলতানের প্রস্তাবের কথা জেনে খুবই আনন্দিত হয়েছেন। তাঁরা এ-মুহূর্তে গজনি যাবার জন্যে প্রস্তুত। আমি তাঁদের যাওয়ার পুরো বন্দোবস্ত করে রেখেছি। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এ পত্র পাওয়ার আগেই আবু সহল আর ইবনে সিনা খারিজম ছেড়ে চলে গেছেন।

সুলতান মাহমুদের খারিজম জয় এবং খারিজম দরবারের পণ্ডিতদের অন্য কোথাও চলে যাওয়া সম্পর্কে ঐতিহাসিক আবুল ফজল বয়হকী আবার অন্য কথা বলেন। তাঁর বর্ণনায় দেখা যাচ্ছে যে, খারিজম শাহ মামুনের সঙ্গে সুলতান মাহমুদের এক বোনের বিয়ে হয়। কিন্তু এরকম ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তার সম্পর্ক গড়ে উঠলেও দিগ্বিজয়ী সম্বন্ধীকে তিনি বিশ্বাস করতেন না। তিনি মাহমুদের ভয়ে এমনই তটস্থ থাকতেন যে, বাগদাদের খলিফার দেয়া উপাধি আর উপঢৌকনের খবর পর্যন্ত তাঁর কাছে গোপন রেখেছিলেন। তুর্কিস্তানের খলিফাদের সঙ্গে সন্ধি করার সময় মাহমুদ মামুনকেও দূত পাঠাতে বলেছিলেন; কিন্তু মামুন তাতে সম্মত হননি। এতেই সুলতান মাহমুদ চটে যান এবং খারিজম কবজা করে নেবেন বলে হুমকি দেন।



www.pathagar.com

গজনির প্রধানমন্ত্রী মামুনের দূতকে বলেন, আপনাদের ব্যবহার সন্দেহজনক! যাই হোক, খারিজমে যদি সুলতান মাহমুদের নামে খোৎবা পাঠ করা হয়, তবেই এ সন্দেহের অবসান হতে পারে। অবশ্য পরামর্শটা একান্তই আমার। এর সঙ্গে সুলতানের কোনো সম্পর্ক নেই।

খবর যখন খারিজমে পৌঁছল, সুলতান মাহমুদ তখন ভারতবর্ষে। খারিজম শাহ সভাসদদের ডেকে নিয়ে পরামর্শে বসলেন। আল বেরুনী বললেন, এ নিয়ে উৎকণ্ঠার কিছু নেই বোধহয়। মন্ত্রী যখন বলছেন যে কথাটা সম্পূর্ণই তাঁর নিজের, কাজেই বিষয়টির তেমন গুরুত্ব দেওয়াটা বোধহয় ঠিক হবে না। কথাটা পুরোপুরি গোপন রেখে কয়েকটা দিন চুপচাপ থাকলেই হয়তো সবকিছু মিটে যাবে। কিন্তু খারিজম শাহ কথাটার তেমন গুরুত্ব দিতে পারলেন না। তিনি বললেন, প্রস্তাবটি মন্ত্রী উত্থাপন করলেও এর পেছনে সুলতান মাহমুদের ইঙ্গিত নিশ্চয়ই রয়েছে। তাই মন্ত্রীর কাছে কাউকে পাঠিয়ে সুলতানের প্রকৃত আদেশটা কী— তা জেনে নিলেই মঙ্গল।

যে কথা, সেই কাজ। গজনিতে পাঠানো হল ইয়াকুব জুন্দীকে। কিন্তু সুলতান তখন ভারতে। এ অবস্থায় মন্ত্রী আর কী আদেশ দিতে পারেন! অবশ্য তিরস্কারে কার্পণ্য করলেন না তিনি। মামুন চিন্তিত হয়ে সেনাপতিদের সঙ্গে আলোচনায় বসলেন। সেনাপতিরা জানালেন, তাঁরা সুলতান মাহমুদের বশ্যতা স্বীকার করতে রাজি নন। বরং অস্ত্র ধরে রুখে দাঁড়াবেন যে-কোনো আগ্রাসনকে। প্রাণ গেলেও দেশের স্বাধীনতার প্রতি বাইরের কারো হস্তক্ষেপ তারা বরদাস্ত করবেন না। মামুন সবাইকে বলেকয়ে শান্ত রাখার চেষ্টা করলেন। প্রভাবশালী ব্যক্তি ও গোষ্ঠীকে উপঢৌকন দিয়ে তখনকার মতো তাদের মুখ বন্ধ রাখলেন। সুলতান মাহমুদকে খুশি করার জন্যে তুর্কিস্তানের সঙ্গে তাঁর সন্ধির ব্যাপারে মধ্যস্থতা করলেন। কিন্তু এই মধ্যস্থতার খবর শুনে যারপরনাই ক্রুদ্ধ হলেন সুলতান মাহমুদ। বলখ থেকে কড়া ভাষায় চিঠি লিখলেন তিনটি শর্ত দিয়ে। শর্তগুলো হচ্ছে : সুলতান মাহমুদের নামে খোৎবা পাঠ করতে হবে, যথাযথ উপঢৌকন প্রেরণ করতে হবে এবং এবারকার মতো ক্ষমা করে দেবার জন্যে অনুরোধ জানাতে বিশিষ্ট ব্যক্তিরা সুলতানের সামনে উপস্থিত হবেন। যে-কোনো একটা শর্ত মানার কথা বলা হলেও অতি উৎসাহী খারিজম শাহ ঠিক করলেন, রাজধানী খারিজম ও জুরজানিয়া ছাড়া দেশের বাকি অংশে মাহমুদের নামে খোৎবা পাঠ করা হবে এবং পাত্রমিত্ররা সুলতানের জন্যে আশি হাজার স্বর্ণমুদ্রা ও তিন হাজার অশ্ব উপঢৌকন হিসেবে নিয়ে গজনি যাবেন। কিন্তু এ প্রস্তাব দেশের সেনাবাহিনীর কাছে গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হল না। তারা উত্তেজিত হয়ে উঠল। রুখে দাঁড়াল এই ধরনের স্তাবকতার বিরুদ্ধে। খারিজমে জ্বলে উঠল বিদ্রোহ-বহ্নি। ১০১৭ খ্রিস্টাব্দে বিদ্রোহীরা রাজপ্রাসাদে হামলা চালিয়ে হত্যা করল মামুনকে। তাঁর বয়েস তখন মাত্র বত্রিশ বছর। সৈন্যরা মামুনকে মেরে ফেলল



www.pathagar.com

ঠিকই; কিন্তু শেষপর্যন্ত ধরে রাখতে পারল না খারিজমের স্বাধীনতা। পরের বছরই খারিজম জয় করে তা নিজের অধিকারে আনেন সুলতান মাহমুদ। খারিজম গজনি সম্রাটের পদানত হলে আল বেরুনী প্রমুখ পণ্ডিত সুলতান মাহমুদের বশ্যতা স্বীকার করে তাঁরই আশ্রয়ে বাস করতে শুরু করেন। কিন্তু ইবনে সিনা ও আরো কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তি সে-সময় খারিজম ছেড়ে পালিয়ে যান।

ইবনে সিনার গুণাবলির খবর সুলতান মাহমুদের অগোচরে ছিল না। নিজামির মতে— ইবনে সিনাকেই বিশেষভাবে পেতে চেয়েছিলেন তিনি। তাই তাঁর পালিয়ে যাওয়ার সংবাদ পেয়ে তিনি খেপে গেলেন। তখনি তলব পড়ল দরবারের প্রধান শিল্পী আবু নসরের। তাঁকে দিয়ে ইবনে সিনার একখানা প্রতিকৃতি আঁকিয়ে অন্যান্য শিল্পীকে সেই ছবির চল্লিশটি অনুকৃতি তৈরি করার নির্দেশ দিলেন সুলতান মাহমুদ। ছবিগুলো আঁকা হলে তা সমগ্র পারস্য ও এশিয়া মাইনরের বিভিন্ন রাজন্য ও নেতৃবৃন্দের কাছে পাঠানো হল। সেইসঙ্গে তাঁদের কাছে লিখিত অনুরোধ জানানো হল যে, ছবিতে যে-লোকটিকে দেখা যাচ্ছে তাঁর নাম ইবনে সিনা। আপনার এলাকায় এর খোঁজ করবেন এবং খুঁজে পেলে পাঠিয়ে দেবেন।

এদিকে ইবনে সিনা ও আবু সহল তখন খারিজম ছেড়ে অনেক অনেক দূরে চলে গেছেন। দুর্গম পথে সে ছিল এক বিরতিহীন যাত্রা। আশৈশবের বিলাসী ও আরামপ্রিয় ইবনে সিনা হেঁটে চললেন ভয়ঙ্কর মরুপথে। আহার-নিদ্রা নেই— কেবল এগিয়ে চলা আর এগিয়ে চলা। সারারাত হেঁটে ভোরবেলাতে তাঁরা পৌঁছলেন এক ছায়াচ্ছন্ন জায়গায়। এখানে কয়েকটা কুয়ো পাওয়া গেল। ঠিক হল, এই জায়গাতেই খানিকটা জিরিয়ে নেবেন তাঁরা।

ইবনে সিনা ও আবু সহল উভয়েই চর্চা করতেন জ্যোতিষ বিজ্ঞানের। নিজেদের ভাগ্যে কী আছে, তা জানার জন্যে তাঁরা বসে গেলেন আঁকজোক কষতে। গণনায় জানা গেল, এবার দুজন পথ হারিয়ে ফেলবেন এবং আরো বেশি দুর্ভোগের মধ্যে নিপতিত হবেন। নিজের ভাগ্য গণনা করে আবু সহল দেখলেন, এ যাত্রায় তিনি অন্তত রেহাই পাচ্ছেন না। হয়তো প্রাণটাই যাবে এবার। ভারাক্রান্ত গলায় তিনি বললেন, এই হয়তো আমাদের শেষ সাহচর্য। আর আমাদের দেখা হবে না।

গণনা ফলে গেল সত্যিসত্যি। বিশ্রামস্থল থেকে রওনা হয়ে যাবার চারদিনের মাথায় উঠল প্রচণ্ড ঝড়। ভয়ঙ্কর এই মরুঝড়ে দুবন্ধু পথ হারিয়ে ফেললেন। সারা আকাশ মেঘাচ্ছন্ন। বালুকণা এসে তীরের ফলার মতো গায়ে বিঁধছে। কোন্ দিকে এগোবেন, ঠাহর করতে না-পেরে তাঁরা দিশেহারা হয়ে পড়লেন। ঝড় একসময় থামল ঠিকই কিন্তু সঠিক গন্তব্যের পথ থেকে তাঁরা অনেকটা সরে গেছেন তখন। মরুঝড়ের তাড়ায় যে-জায়গায় এসে থামলেন সে এক রাক্ষুসে মরুভূমি। চারদিকে কেবল বালু আর বালু। পানির কোনো চিহ্ন নেই। প্রচণ্ড গরমে ক্ষুৎ-পিপাসায় কাতর



www.pathagar.com

হয়ে আবু সহল মসীহি প্রাণত্যাগ করলেন। নিরুপায় পথপ্রদর্শক ফিরে চলল খারিজম অভিমুখে। কিন্তু ইবনে সিনার তো আর ফেরার উপায় নেই! অমানুষিক কষ্টের পর অজানা-অচেনা মরুপ্রান্তর পেরিয়ে অবশেষে তিনি আবিওয়ার্দে পৌঁছলেন। কিন্তু জায়গাটা তেমন পছন্দ হল না ইবনে সিনার। তাই চলে গেলেন তিনি তুসের দিকে। নাহ্, এ স্থানটিও বিশেষ সুবিধের নয়। সুলতান মাহমুদের ভয় তাঁকে তাড়া করে ফিরছে। জায়গাটাকে মোটেই নিরাপদ মনে হচ্ছে না। হঠাৎ ইবনে সিনার মনে পড়ে গেল নিশাপুরের কথা। কী সুন্দর নাম— নিশাপুর! কিন্তু কবি ওমর খৈয়ামের সেই নিশাপুরে পৌঁছেই ইবনে সিনার চক্ষু তো ছানাবড়া। এলাকায় পা দিতে-না-দিতেই তিনি দেখেন, তাঁরই ছবি হাতে কয়েকটা লোক এদিক-ওদিক ঘুরছে। তাঁর বুঝতে আর বাকি রইল না যে, প্রতিহিংসাপরায়ণ সুলতানের লেলিয়ে দেয়া লোকেরা ছবি হাতে নিয়ে তাঁকেই হন্যে হয়ে খুঁজে বেড়াচ্ছে। তিনি সঙ্গে সঙ্গে ওখান থেকে সরে পড়লেন।

ক'দিন পরই ইবনে সিনাকে দেখা গেল, গুরগাঁওয়ের রাস্তায় হনহন করে হেঁটে যেতে। এই রাজ্যের শাসনকর্তা কাবুস বিন ওয়াসমগির ছিলেন বহুগুণে গুণান্বিত মানুষ। আরবি ও পারসি ভাষায় ছিল তাঁর সমান দখল। বিশিষ্ট সাহিত্যিক হিসেবেও তাঁর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছিল চারদিকে। এমন একজন নৃপতির রাজসভায় যে বিদ্বানমণ্ডলীর সমাবেশ ঘটবে, এতে আর আশ্চর্য কী! আল বেরুনী খারিজম ছেড়ে আসার পর এখানেই থেকে যান বেশ কিছুদিন। তিনি তাঁর অমর গ্রন্থ 'আল আসারুল বাকিয়া মিনাল কুরুনিল খালিয়া' বা 'প্রাচীন জাতিসমূহের ইতিবৃত্ত' উৎসর্গ করেন কাবুসের নামেই।

কাবুস বিন ওয়াসমগিরের লেখা বইগুলো আরবি সাহিত্যের সম্পদ। তাঁর লেখার হাতই কেবল নয়, হাতের লেখাও এত সুন্দর ছিল যে, সমসাময়িক বিশিষ্ট সাহিত্যিক বুয়াইদ নৃপতিদের মন্ত্রী ইসমাইল ইবাদ বিস্মিত হয়ে মন্তব্য করেছিলেন, 'এগুলো কি হস্তাক্ষর, না ময়ূরের পালক?' পারসিতে লেখা কাবুসের কবিতাগুলোও ছিল অতি সুখপাঠ্য। তবে তাঁকে কেবল কবি বা কথাশিল্পী বলে গণ্য করলে ভুল হবে। কেননা, তিনি সুপণ্ডিত ছিলেন দর্শন আর গণিতেও।

কাবুস যে বিদ্বানদের সমাদর করতেন, আল বেরুনীর জীবনী থেকেই তাঁর প্রমাণ পাওয়া যায়। কাবুস তাঁকে সভাসদ পদ দিয়ে নিজের প্রাসাদেই বসবাস করতে দিতে চেয়েছিলেন। এমনকি তাঁর সমস্ত সম্পত্তির ওপর আল বেরুনীকে অধিকার দিতে এবং রাজ্যের অংশীদার হিসেবে মনোনীত করতে চেয়েছিলেন। আল বেরুনী অবশ্য এতে রাজি হননি।

নানারকম গুণ থাকলেও কাবুস একেবারে নির্ভেজাল মানুষ ছিলেন না। নির্মম প্রকৃতির লোক ছিলেন তিনি। সামান্য অপরাধের জন্যে চরম দণ্ড দিতেন তিনি



www.pathagar.com

নির্দ্বিধায়। যেজন্যে আল বেরুনী একজায়গায় লিখেছেন— তাঁর নিষ্ঠুরতার জন্যে আমি তাঁকে শ্রদ্ধা করতে পারতাম না। তবে এ-কথাও তিনি লিখেছেন যে, অন্যান্য গুণের মধ্যে তাঁর যে-গুণটি আমাকে বিমোহিত করে, তা হল— সামনাসামনি নিজের প্রশংসা তিনি কোনোদিনই পছন্দ করতেন না। যেজন্যে নওরোজ ও মিহিরগন উৎসবের সময় তিনি দরবারে সমাগত কবিদের লেখা প্রশংসাগীতি না-শুনেই পুরস্কার দিয়ে দিতেন।

কাবুসের নানারকম গুণের খবর জানা থাকলেও গুরগাঁওয়ে পৌঁছে মূলত মাহমুদের ভয়েই এক সরাইখানায় উঠলেন ইবনে সিনা। কিন্তু বড় প্রতিভা বেশিদিন আত্মগোপন করে থাকতে পারে না। তাঁর পরিচয় একসময় বেরিয়ে পড়েই। ইবনে সিনার বেলাতেই-বা তার ব্যতিক্রম হবে কেন? সরাইখানায় থাকার সময় এক দরিদ্র রোগীর যাতনা দেখে কাতর হয়ে পড়েছিলেন তিনি। সঙ্গে সঙ্গে সুচিকিৎসার মাধ্যমে লোকটিকে তিনি সারিয়ে তুললেন। বহুদিন ধরে দুরারোগ্য ব্যাধিতে ভুগছিল ওই লোকটা। ইবনে সিনার চিকিৎসায় তার দ্রুত আরোগ্য লাভের খবর ছড়িয়ে পড়ল দিকে দিকে। আর অসংখ্য রোগী এসে ভিড় জমাতে লাগল ওই সরাইখানায়। রোগী দেখে ইবনে সিনা অর্থও উপার্জন করতে লাগলেন প্রচুর। তাঁর দুর্ভোগের মেঘ আবার কেটে যেতে লাগল আস্তে আস্তে। তাই বলে অবশ্য তিনি নিজের পরিচয় প্রকাশ করার দুঃসাহস দেখালেন না। সুলতান মাহমুদের প্রতি তাঁর ভীতি ও বিতৃষ্ণা এতটাই বেশি ছিল যে, কাবুসের সঙ্গে পরিচিত হবার কোনো আগ্রহই তাঁর মধ্যে দেখা গেল না।

হঠাৎ কাবুসের এক আত্মীয় পড়লেন কঠিন অসুখে। কত জায়গা থেকে নামকরা সব চিকিৎসক এলেন! কিন্তু রোগটা যে কী— তাই-ই কেউ ধরতে পারলেন না। কাবুস এই ছেলেটাকে খুবই আদর করতেন। তিনি হতাশ হয়ে পড়লেন। একদিন তাঁর কানে এল, সরাইখানায় ঠাঁই নেয়া সেই গুণী চিকিৎসকের কথা। তিনি তাঁকে নিয়ে আসার জন্যে লোক পাঠালেন।

ইবনে সিনা রোগীকে দেখে বিস্মিত হলেন। খুবই সুন্দর ও স্বাস্থ্যবান যুবক। তিনি তাঁর নাড়ি দেখলেন। প্রস্রাব পরীক্ষা করলেন। তারপর গম্ভীর হয়ে কী যেন ভাবতে লাগলেন। কিছুক্ষণ চিন্তা করার পর ইবনে সিনা বললেন, এমন একটা লোক ডেকে আনুন যে গুরগাঁওয়ের সমস্ত এলাকা ভালোভাবে চেনে। কথামতো, খুঁজে-পেতে তেমনি একটা লোক ডেকে আনা হল। ইবনে সিনা রোগীর নাড়ি ধরে লোকটাকে একদিক থেকে নগরের মহল্লাগুলোর নাম আউড়ে যেতে বললেন। নাম বলা শেষ হলে ইবনে সিনা লোকটাকে বিদায় দিয়ে বললেন, আমি এরকম একজন লোক চাই, যে একটি বিশেষ মহল্লার সবক'টা রাস্তার নাম জানে। লোক ডেকে আনা হল যথারীতি। ইবনে সিনাও আগের মতো তার মুখে কিছু রাস্তার নাম শুনে তাকে


www.pathagar.com

বিদায় দিয়ে এমন একজন লোক ডেকে আনতে বললেন, যে কোনো বিশেষ রাস্তার প্রতিটি বাড়ির খবর রাখে। কথামতো, ঠিক তেমনি একটা লোক ডেকে আনা হল ইবনে সিনার কাছে। আগের মতোই রোগীর নাড়ি ধরে রেখে ইবনে সিনা লোকটাকে ওইসব বাড়ির প্রতিটি লোকের নাম বলে যাবার নির্দেশ দিলেন। লোকটা গড় গড় করে নাম আউড়ে যাচ্ছিল। একটা নাম উচ্চারণ করার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ইবনে সিনা বলে উঠলেন, থামো! আর কোনো নাম বলবার দরকার নেই। তারপর কাবুসের হতভম্ব অমাত্যদের দিকে মুখ তুলে তিনি বললেন, এই যুবকের কোনো অসুখ হয়নি। তবে প্রেমকে যদি অসুখ বলা হয়, সে-কথা আলাদা। যাই হোক, এ রোগের একমাত্র ওষুধ হল মেয়েটির মুখ দর্শন।

এই কথা কানে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে রোগীর মুখ লজ্জায় লাল হয়ে উঠল। আর চিকিৎসকের কথামতো কাবুসের লোকেরা খোঁজখবর নিয়ে জানতে পারল যে, তাঁর কথা অক্ষরে অক্ষরে সত্য। তারা খুবই তাজ্জব বনে গিয়ে এ খবর কাবুসকে জানাল। বুদ্ধিমান কাবুস সহজেই বুঝতে পারলেন, কাঙ্ক্ষিত নাম উচ্চারণের পর রোগীর নাড়ির গতি বেড়ে যাওয়ার ফলেই বিজ্ঞ চিকিৎসক সমস্ত ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছেন। তিনি মুগ্ধ ও বিস্মিত হয়ে চিকিৎসককে তাঁর কাছে নিয়ে আসতে আদেশ করলেন।

ইবনে সিনা আর কী করেন! কাবুসের দরবারে আসতে একরকম বাধ্যই হলেন তিনি। আর তাঁর মুখের ওপর চোখ পড়বার সঙ্গে সঙ্গে চমকে উঠলেন কাবুস। আরে, এই তো সেই ইবনে সিনা! বলা বাহুল্য, সুলতান মাহমুদের পাঠানো ইবনে সিনার একখানা ছবি কাবুসের কাছেও ছিল। তিনি তাঁর সামনে এক কিংবদন্তির মহানায়ককে দেখে আত্মমর্যাদার কথা ভুলে গিয়ে সিংহাসন থেকে নেমে এসে তাঁকে আলিঙ্গন করলেন।

পরে ইবনে সিনারই নির্ধারিত এক শুভদিনে যুবক-যুবতীর শুভ বিবাহ সুসম্পন্ন হয়। যুবকটিও যে তখন আর ব্যাধিগ্রস্ত নেই— তা তো বলাই বাহুল্য। এই ঘটনার মধ্য দিয়েই কাবুসের দরবারে পাকাপাকি ঠাঁই হয়ে গেল ইবনে সিনার। নৃপতি তাঁকে ন্যায় এবং জ্যোতিষশাস্ত্রের অধ্যাপনা কাজে নিযুক্ত করলেন।

কাবুসের বর্ণাঢ্য শাসনামলের অবসান ঘটে ১০১২ খ্রিস্টাব্দে। এর কারণ বিদ্রোহ। তহবিল তসরুফের সন্দেহে হাজিব নাঈম নামে এক সভাসদকে কাবুস প্রাণদণ্ড দিয়েছিলেন। অন্য সভাসদরা এতে তাঁর ওপর বিরূপ হয়ে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। কাবুস বিদ্রোহীদের হাতে কারসক দুর্গে বন্দি হন এবং ১০১২ খ্রিস্টাব্দে ঘাতকের হাতে নিহত হন। শোনা যায়, তাঁর ছেলেও বিদ্রোহীদের সঙ্গে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিলেন, তাই পিতৃহত্যায় বাধা দেন নি।



www.pathagar.com

কাবুসের পতনের পর ইবনে সিনা গুরগাঁও থেকে পালিয়ে যান। কিছুদিন পর তিনি রাই নামক স্থানে উপস্থিত হন। মাঝখানের সময়টুকুতে তিনি কোথায় ছিলেন, সে-সম্পর্কে বিস্তারিত জানা যায় না। ইবনে সিনার অন্যতম জীবনীকার ইবনে খাল্লিকানের মতে, কাবুসের মৃত্যুর পর ইবনে সিনা প্রথমে যান দেহেস্তানে। সেখানে তিনি গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েন। ব্যাধি নিরাময়ের পর তিনি আবার ফেরেন গুরগাঁওয়ে এবং 'আল আওসাফ' নামে একখানা বই লেখেন। কিন্তু শান্তিময় অথচ নীরব নিভৃত জীবনযাপন করতে গিয়ে হাঁপিয়ে উঠলেন তিনি। চলে এলেন দশম শতাব্দীর বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক ও চিকিৎসক আল রাজীর জন্মস্থান ও কর্মভূমি রাইতে। এখানে তিনি দার্শনিক আমির মজিদ উদ্দৌলার আনুকূল্য লাভে সমর্থ হন। অবশ্য এর কারণও আছে। ইবনে সিনার চিকিৎসাতেই তিনি আরোগ্য লাভ করেছিলেন। কিন্তু রাইতে তাঁর প্রাচুর্যময় জীবন কাটানো দীর্ঘস্থায়ী হল না। সুলতান মাহমুদ রাই আক্রমণ করবেন বলে জোর গুজব শোনা যাচ্ছিল। ইবনে সিনা রাই ছেড়ে কাসবিন ও সেখান থেকে হামাজানে চলে গেলেন। হামাজান সে-সময় শামসুদ্দৌলার শাসনাধীন।

লক্ষণীয় ব্যাপার এই, ব্যাধিগ্রস্ত শামসুদ্দৌলাকে আরোগ্য করার মাধ্যমেই ইবনে সিনা হামাজান দরবারে প্রবেশ করতে সক্ষম হন। এখানেই তিনি পরিচয় দিতে পেরেছিলেন সর্বাধিক সাফল্যের। তাঁর প্রতিভায় মুগ্ধ হয়ে শামসুদ্দৌলা তাঁকে মন্ত্রী হিসেবে নিযুক্ত করেন। দায়িত্বপূর্ণ মন্ত্রীর পদে অধিষ্ঠিত থাকলেও দর্শন ও বিজ্ঞান-চর্চা অব্যাহত ছিল ইবনে সিনার। সেইসঙ্গে চিকিৎসাবিদ্যা তো আছেই। কিন্তু দেশের সৈন্যরা একজন নির্বিরোধী পণ্ডিতকে মন্ত্রী হিসেবে তেমন পছন্দ করত না। একদিন কী হয়েছে, সৈন্যরা ইবনে সিনার বাড়িতে হামলা চালিয়ে সবকিছু ভেঙে গুঁড়িয়ে তছনছ করে দিল। কেবল তাই নয়, তারা মন্ত্রীকে বন্দি অবস্থায় হাজির করল শামসুদ্দৌলার সামনে। দাবি জানাল, প্রকাশ্যে এর প্রাণদণ্ড দিতে হবে।

শামসুদ্দৌলা পড়লেন উভয় সঙ্কটে। মনে মনে তিনি সৈন্যদের কাজের পক্ষপাতী না হলেও তাদের দাবি একেবারে উড়িয়ে দিতেও পারলেন না। ইবনে সিনা কোনো অপরাধও হয়তো-বা সেই সময়ে করে থাকতে পারেন— যেজন্যে শামসুদ্দৌলা প্রকাশ্যে তাঁকে সাহায্য করতে সাহস পেলেন না। পরে অবশ্য তিনি গোপনে মুক্তি দিয়ে আত্মগোপন করে থাকতে বললেন ইবনে সিনাকে।

শামসুদ্দৌলার পরামর্শমতো ইবনে সিনা লুকিয়ে রইলেন আবু সাঈদ নামে এক বন্ধুর বাড়িতে। ক্রমে বৈজ্ঞানিক মন্ত্রীর কথা একরকম ভুলেই গেল হামাজানবাসী। উত্তেজিত সৈন্যরাও হয়ে এল শান্ত। ইবনে সিনার বিড়ম্বিত জীবনের কথা চিন্তা করে বেশ অস্বস্তিতেই ছিলেন শামসুদ্দৌলা। তিনি ভাবছিলেন, কাউকে



www.pathagar.com

অসন্তুষ্ট না করে কীভাবে আবার ইবনে সিনাকে ফিরিয়ে আনা যায় আগের সেই সম্মানজনক পদে।

অল্পদিনের মধ্যেই সুযোগ এসে গেল। চিকিৎসা-নৈপুণ্যের মধ্য দিয়েই ইবনে সিনা আবার ফিরে পেলেন হারানো মর্যাদা। অবশ্য এর পেছনে শামসুদ্দৌলার হাত ছিল যথেষ্ট। ইবনে সিনার নির্বাসনের কিছুদিন পরেই গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েন শামসুদ্দৌলা। রাজসভার বাঘা-বাঘা সব চিকিৎসক অনেক চেষ্টার পরও সে ব্যাধির উপশম ঘটাতে পারলেন না। সারাটা রাজ্যের ওপর ঘনিয়ে এল একটা উদ্বেগের ছায়া। এবার লোকের মনে পড়ে গেল ইবনে সিনার কথা। সবাই ভাবল, আজ যদি ইবনে সিনা থাকতেন তাহলে অসুস্থ নৃপতি সহজেই রোগমুক্ত হতেন। সবার প্রিয় শামসুদ্দৌলাকে এমন প্রচণ্ড রোগযাতনা সহ্য করতে হত না। কেবল ভাবনাচিন্তা নয়, কথাটা ফিরতে লাগল সবার মুখে মুখে। অবস্থা এমন দাঁড়াল যে, আগে যেসব লোক ইবনে সিনার প্রাণদণ্ড চেয়েছিল, তারা লজ্জায় অধোবদন হল।

এরকম এক উপযুক্ত সময়ে শামসুদ্দৌলা ঘোষণা করলেন, ইবনে সিনাকে সত্যি সত্যি মেরে ফেলা হয়নি। তাঁর মতো প্রতিভা যে-কোনো রাজ্যের গৌরব— এই কথা বিবেচনা করে তাঁকে হত্যা না করে গোপনে মুক্তি দেয়া হয়েছিল। এখন ইচ্ছে করলেই আবার তাঁকে ফিরিয়ে আনা যেতে পারে। বলাই বাহুল্য, এ প্রস্তাবে কোনো আপত্তি তো উঠলই না; বরঞ্চ ইবনে সিনা বন্ধুর বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসে আবার বহাল হয়ে গেলেন নিজের পদে। কেবল তাই-ই নয়, অনুতপ্ত বিদ্রোহী সৈন্যরা, এমনকি স্বয়ং নৃপতিও তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করলেন।

হামাজানের মন্ত্রীপদে বহাল থাকার দ্বিতীয় পর্যায়ে ইবনে সিনা তাঁর বিখ্যাত বই 'আশ শেফা' ও 'আল কানুন' রচনায় হাত দেন। কাজের চাপ খুব বেশি থাকা সত্ত্বেও গ্রন্থ রচনায় বিরতি দেননি তিনি। দিনের বেলায় ব্যস্ত থাকতেন সরকারি দায়িত্ব পালনে। রাতে ছাত্ররা আসত দর্শন ও চিকিৎসা বিষয়ে পাঠ নিতে। এর ওপর আবার ছিল আড্ডা, চিত্তবিনোদন ও অধ্যয়ন। কিন্তু এরপরও লেখার কাজে তাঁর বিরতি ঘটত না। মন ঢেলে দিতেন গ্রন্থ রচনায়।

একবার দরকারি কাজে রাজধানীর বাইরে যেতে হল আমিরকে। রাজধানীর ভার দিয়ে গেলেন তিনি শেখের ওপর। শেখ অর্থাৎ ইবনে সিনা। জনগণ তাঁকে শেখ বা জ্ঞানী বলে ডাকতে শুরু করে মাত্র তাঁর উনিশ বছর বয়সেই। যাই হোক, যাত্রাপথে আবার সেই কঠিন রোগে আক্রান্ত হলেন শামসুদ্দৌলা। নানারকম অনিয়ম করে করে নিজের বিপদ তিনি নিজেই ডেকে এনেছিলেন। সঙ্গের চিকিৎসকরা চেষ্টার কোনো ত্রুটি রাখলেন না। চরম অসুস্থ অবস্থায় রাজধানীতে



www.pathagar.com

ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করা হল তাঁকে। কিন্তু ফেরার পথেই মারা গেলেন তিনি। একজন অকৃত্রিম বন্ধুর এমন আকস্মিক মৃত্যুতে ভেঙে পড়লেন ইবনে সিনা। কেবল তাই নয়; তাঁর সাজানো-গোছানো মর্যাদাময় জীবনে নেমে এল অনিশ্চয়তার কালো ছায়া।

## দশ

শামসুদ্দৌলার মৃত্যুর পর হামাজানের আমির হলেন তাঁর ছেলে শামাউদ্দৌলা—মতান্তরে তাজউদ্দৌলা। ইবনে সিনাকে তিনিও পেতে চাইলেন মন্ত্রীরূপে। কিন্তু শেখ তাতে সম্মত হলেন না। তাঁর হয়তো মনে হয়েছিল, শামাউদ্দৌলার কাছে তিনি সত্যিকার কদর পাবেন না। তিনি ঠিক করলেন, ইস্পাহানে যাবেন।

এ-সময় ইস্পাহানের শাসনকর্তা ছিলেন বুয়াইদ বংশীয় আলাউদ্দৌলা বিন কাকুরী। আমির আলাউদ্দৌলার কাছে চিঠি লিখে তিনি তার জবাবের জন্যে অপেক্ষা করতে থাকলেন। এ-সময় ইবনে সিনা উঠে এসেছেন বন্ধু আবু গালেব আততারের বাড়িতে। এখানে বসেই তিনি 'আশ শেফা' রচনার কাজে আবার দিয়েছেন মনোযোগ। বইটি ছিল কুড়ি খণ্ডে বিভক্ত। সে যুগে দর্শনের ওপর লেখা এতবড় বই আর একটিও ছিল না। যাই হোক, হঠাৎ ঘনিয়ে এল এক নতুন বিপদ। চুপে চুপে ইস্পাহানের আমিরের কাছে লেখা তাঁর চিঠির খবর ফাঁস হয়ে গেল শামাউদ্দৌলার কাছে। তিনি তো প্রচণ্ড রেগে গেলেন এবং ইবনে সিনাকে আটক করে জেলে পুরে রাখলেন। প্রায় চার মাস কারাগারে কাটাবার সময় ইবনে সিনা তিনটি বই লেখেন।

এই সময়ই ইস্পাহানের আলাউদ্দৌলা আকস্মিকভাবে হামলা চালালেন হামাজানে। শামাউদ্দৌলা হেরে গেলেন যুদ্ধে। তাঁকে বন্দি রাখা হল ইয়াজদান বা যারুদজান দুর্গে। কিছুকাল আগে তিনিই এ দুর্গে আটকে রেখেছিলেন ইবনে সিনাকে। আলাউদ্দৌলা কিন্তু শামাউদ্দৌলাকে সিংহাসনচ্যুত না করেই ফিরে গেলেন নিজ রাজ্যে। এ-সময় শামাউদ্দৌলাও ইবনে সিনাকে মুক্তি দিলেন এবং নিয়ে এলেন হামাজানে। কিন্তু যোগ্য পদে নিয়োগ করার প্রতিশ্রুতি দিয়েও তা পালন করলেন না। ইবনে সিনা মনঃক্ষুণ্ন হয়ে এবার তাই আশ্রয় নিলেন এক আলাবী সৈয়দের ঘরে। রাজনীতি-চর্চা ছেড়েই দিলেন তিনি। কারো সঙ্গে এ-সময় মেলামেশাও করতেন না। কিন্তু এইভাবে বেশিদিন কাটানো তাঁর ধাতে সইবে কেন? অবশেষে একদিন শেষ রাতের দিকে ভাই মাহমুদ এক বন্ধু ও দুজন ভৃত্যকে সঙ্গে নিয়ে দরবেশের বেশ ধরে তিনি হামাজান ত্যাগ করলেন। বহু কষ্টের পর তিনি ইস্পাহানে পৌঁছলে, সে সংবাদ শোনার সঙ্গে সঙ্গে বাদশাহ আলাউদ্দৌলা বহু মহার্ঘ্য উপহার সামগ্রীসহ এসে তাঁকে



www.pathagar.com

অভ্যর্থনা জানালেন। কিছুদিনের মধ্যেই ইবনে সিনা যথাযোগ্য মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হলেন ইস্পাহানের শাহি দরবারে। তাঁর বিচক্ষণতায় সন্তুষ্ট হয়ে আলাউদ্দৌলা তাঁকে নিযুক্ত করলেন রাজ্যের মন্ত্রী হিসেবে।

ইবনে সিনার নাম তখন ছড়িয়ে পড়েছে গোটা দুনিয়ায়। ইস্পাহানের মানুষ যখনই শুনল, সেই প্রবাদপুরুষ স্বয়ং তাঁদের দেশে এসে পৌঁছেছেন, তখন থেকেই তারা দলে দলে আসতে শুরু করেছিল তাঁর মুখদর্শনে। তিনি মন্ত্রীর দায়িত্ব পাবার পরও তাঁর কাছে লোকজন আসার বিরাম ছিল না। শেখকে কেন্দ্র করেই আলাউদ্দৌলা প্রতি শুক্রবার রাতে মুশায়েরা বা কবি-জলসার আয়োজন করার নির্দেশ দিলেন। এই কবিসভার খ্যাতি দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়েছিল। দূরদূরান্তের বহু কবি-সাহিত্যিক স্রেফ তাঁকে একটুখানি দেখার আশায় শরিক হতেন এই মুশায়েরায়।

ইস্পাহানে থাকার সময়ই ইবনে সিনা 'আশ শেফার' অসমাপ্ত অংশটুকুর কাজ শেষ করেন। ইস্পাহানের মন্ত্রী হয়েছেন তিনি। কিন্তু শামাউদ্দৌলার নিপীড়নের কথা ভুলে যাননি আদপেই। মূলত ইবনে সিনার কূটনৈতিক চালেই আলাউদ্দৌলা আবার হামাজানে হামলা চালিয়ে শামাউদ্দৌলাকে বিতাড়িত করেন এবং রাজ্যটি দখল করে নেন।

ইবনে সিনা যে একসময় আলাউদ্দৌলার অত্যন্ত বিশ্বস্ত ও অন্তরঙ্গ বন্ধুতে পরিণত হন, তার প্রমাণ পাওয়া যায় 'চাহার মাকালার' বর্ণনায়। চিকিৎসাশাস্ত্রে ইবনে সিনার বিস্ময়কর দক্ষতার কথা বলতে গিয়ে নিজামি এক আশ্চর্য ঘটনা বর্ণনা করেছেন।

একবার বুয়াইদ বংশীয় একজন যুবক আক্রান্ত হল এক বিচিত্র ব্যাধিতে। এরকম রোগের কথা কেউ কখনো শোনেনি। অসুস্থ যুবার বদ্ধমূল ধারণা হয়েছে, সে একটা গরু! তাই গরুসুলভ আচরণও সে শুরু করে অল্পদিনের মধ্যে। যখন-তখন সে 'হাম্বা হাম্বা' শব্দ করত আর সবাইকে কাতর গলায় অনুরোধ জানাতো— 'দয়া করে আমাকে জবাই করুন। আমি খুব ভালো গরু। আমার মাংসে উৎকৃষ্ট কাবাব হবে।'

যুবকের এরকম অসহ্য আচরণে বাড়ির লোকরা তো বটেই; পাড়া-পড়শিরাও অতিষ্ঠ হয়ে উঠল। কিন্তু শেষপর্যন্ত যুবকটির এমন অবস্থা হল যে, সে খাওয়া-দাওয়া সম্পূর্ণ ছেড়ে দিল। রাজবংশের ছেলের চিকিৎসায় হেকিম-বদ্যির অভাব হবার কথা নয়। গণ্ডায় গণ্ডায় ডাক্তার কবিরাজ এল। এল রকমারি সব ওষুধ-পথ্য। কিন্তু কিছুতেই কিছু হয় না। যুবকের 'হাম্বা হাম্বা' রব আর জবাই করার একঘেয়ে আবদারে সবাই বিরক্তির একশেষ!

আলাউদ্দৌলা অবশেষে এ ব্যাপারে শরণাপন্ন হলেন তাঁর বিচক্ষণ ও নির্ভরযোগ্য মন্ত্রী ইবনে সিনার। গুরুত্বপূর্ণ রাজদায়িত্ব পালনে অসম্ভব ব্যস্ততার জন্যে নৃপতি তাঁর



www.pathagar.com

অসুস্থ আত্মীয়ের কথা ইবনে সিনাকে বলবারই অবকাশ পাননি। ইবনে সিনা তাঁর মুখ থেকে সবকিছু শুনে রোগীর কাছে লোক মারফৎ এই সুখবর পাঠালেন যে, 'আর কোনো চিন্তা নেই। তোমাকে জবাই করার জন্যে সত্যি একজন কসাই আসছে এবার।' যখন খবর দেয়া হল, রোগীর তখন একেবারে মুমূর্ষু অবস্থা। কিন্তু কসাই আসছে— এই কথাটা কানে আসবার সঙ্গে সঙ্গেই সে খুশিতে শয্যার উপর উঠে বসল।

ইবনে সিনা নিজেই একটা মস্ত চকচকে ছুরি হাতে রোগীর ঘরে ঢুকে হাঁক দিলেন, 'কই, গরুটা কোথায়? আমি জন্তুটাকে জবাই করতে এসেছি।' রোগী তো সঙ্গে সঙ্গে 'হাম্বা হাম্বা' আওয়াজ করে নিজের অবস্থান ঘোষণা করতে শুরু করল মহা আনন্দে। কসাইরূপী মন্ত্রী বললেন, 'তোমরা চটপট গরুটাকে ভালো করে বেঁধে ফ্যাল তো! হুঁশিয়ার, পা-গুলোকে কষে বাঁধবে কিন্তু। একটুও যেন নড়তে না পারে।' অন্য কেউ সেই হুকুম তামিলের সুযোগ পেল না। তার আগেই রোগী রোগশয্যা থেকে দৌড়ে এসে মেঝের উপর কাৎ হয়ে শুয়ে পড়ল। নড়াচড়া একদম নেই। তবুও কসাইয়ের কথামতো কয়েকজন তাগড়া লোক মোটা একগাছা দড়ি এনে যুবকের হাত-পা-গুলো বেঁধে ফেলল।

এবার ছুরি বাগিয়ে ধরে এগিয়ে এলেন ইবনে সিনা। প্রকৃত কসাই যেমন সত্যিকার গরুকে জবাই করার আগে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে— তিনি ঠিক সেইভাবেই পরখ করতে লাগলেন রজ্জুবদ্ধ যুবকটিকে। কিছুক্ষণ হাত-পা টিপেটুপে দেখে মুখ বেঁকিয়ে বললেন, 'এ তো দেখছি একটা হাড্ডিসার গরু। এই রোগা গরুর গোশত কে খাবে? নাহ্— এরকম একটা টিঙটিঙে গরু জবাই করতে রাজি নই আমি। একে বেশি বেশি ঘাস-পানি খাওয়াতে হবে, বুঝলে? তাহলে শিগগির সে জবাই করার উপযুক্ত হবে। এখন এই বাজে গরুটাকে জবাই করা যাবে না।' তারপর রোগীর দিকে চেয়ে বললেন, 'ভালোভাবে খড়বিচালি খাও— বুঝতে পারলে! তোমাকে বেশ মোটাতাজা হতে হবে। নইলে গলায় ছুরি ধরবে না!'

আশ্চর্য! কথামতো কাজ হল। অল্প কয়েকদিনের মধ্যে রোগীর ক্ষুধামান্দ্য দূর হল এবং আগের মতোই তার খিদে পেতে লাগল। সে পেট ভরে খেতে শুরু করল। সেইসঙ্গে তার খাবারের মধ্যে মিশিয়ে দেয়া চলতে লাগল ইবনে সিনার দেয়া ওষুধ। এক মাসের মধ্যে দেখা গেল, আশ্চর্য ফল। যুবকটি সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠল। নিজেকে তার অবিরাম গরু মনে করা এবং অবিলম্বে জবাই হবার বাসনা মিলিয়ে গেল বিস্ময়করভাবে।

হামাজান অভিযানে ইবনে সিনা সঙ্গী হয়েছিলেন আলাউদ্দৌলার। সেখান থেকে ফেরার পথে পেটের পীড়ায় আক্রান্ত হলেন তিনি। যন্ত্রণা অসহ্য হয়ে উঠলে কড়া ওষুধ খেতে শুরু করলেন। কিন্তু ফল পেলেন না তেমন। এক ভৃত্য এসময় তাঁর কিছু টাকা চুরি করে। ধরা পড়ার ভয়ে সে প্রভুকে ওষুধ দেবার সময় তাতে আফিম



www.pathagar.com

মিশিয়ে দিত। যেন তিনি সবসময় ঘোরের মধ্যে থাকেন এবং টাকা চুরি যাবার ঘটনা টের না পান। কিন্তু এতে আরো দুর্বল ও অসুস্থ হয়ে পড়তে লাগলেন ইবনে সিনা। অফিমের বিষক্রিয়ায় এই কীর্তিমান পুরুষের জীবনশক্তিও শেষ হয়ে এল আস্তে আস্তে।

ইবনে সিনা বুঝতে পারলেন, তাঁর জীবনের মেয়াদ ফুরিয়ে এসেছে। বহুবার মৃত্যুকে ফাঁকি দিতে সক্ষম হলেও এবার তার হাত থেকে রেহাই পাবার কোনো উপায় নেই। ক্রীতদাসদের তাড়াতাড়ি মুক্ত করে দিলেন তিনি। পূর্বতন মালিকদের ফিরিয়ে দিলেন জোর করে কেড়ে নেয়া সমস্ত সম্পত্তি। গরিবদের মধ্যে বিলিয়ে দিলেন নিজের যাবতীয় ধনরত্ন। তওবা করলেন নিজে নিজেই। তিন দিনের মধ্যে শেষ করলেন পবিত্র কোরআন শরিফ।

সেদিন ইবনে সিনার বয়েস ছিল তিপ্পান্ন বছর। ১০৩৭ খ্রিস্টাব্দ। ৪৩৮ হিজরির রমজান মাস। তিনি অসুস্থ শরীরে; কিন্তু সজ্ঞানে শেষনিশ্বাস ত্যাগ করলেন শোকাকুল আমির ও ভক্তবৃন্দ পরিবৃত অবস্থায়।

হামাজান নগরীর পশ্চিম দেয়ালের নিচে বিশ্ববরেণ্য ইবনে সিনার কবর আজো বিদ্যমান।



www.pathagar.com

www.pathagar.com

www.pathagar.com